গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭২ বর্ষ ১ সংখ্যা | ২ - ৮ আগস্ট ২০১৯ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ২ টাকা | পৃ. ১

৫ আগস্ট স্মরণে

"এদেশে কমিউনিস্ট পার্টি নামধারী দলটির জন্মের পর থেকে সংগ্রামের ইতিহাস, অর্থাৎ সংগ্রাম পরিচালনার কায়দা ও পরিচালনার সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচনা করে এবং দেশের মূল রাজনৈতিক অবস্থা এবং রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণ করবার জন্য এই পার্টিটি যতবার মূল রণনীতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছে, অর্থাৎ মূল বিপ্লবী তত্ত্ব গ্রহণ করবার চেষ্টা করেছে, সেই সমস্ত তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রাত্যহিক আচরণের ক্ষেত্রে সংস্কৃতিগত মান, যা নিয়ে পরে বিশদভাবে আমি আপনাদের সামনে আলোচনা করব, সে সমস্ত বিষয় লক্ষ করে — এই দলটি যে গঠনের শুরু থেকেই কমিউনিজমের তক্‌মা এঁটে একটি পেটিবুর্জোয়া পার্টির মতো আচরণ করে এসেছে — এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই কেবলমাত্র আমরা ভারতবর্ষের সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী দল, অর্থাৎ মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দল হিসাবে এস ইউ সি আই-কে গড়ে তুলেছি।

কারণ, মার্কসবাদ অনুযায়ী আমরা জানি, দল শুধুমাত্র কতকগুলো ব্যক্তিবিশেষের সমষ্টি নয়, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে যে কোনও রাজনৈতিক দলই কোনও না কোনও শ্রেণির দল। অর্থাৎ উৎপাদনের বিকাশের একটি বিশেষ ঐতিহাসিক স্তরে একটি দেশে যে শ্রেণিগুলির অস্তিত্ব বর্তমান থাকে তার কোনও না কোনও একটির রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, আদর্শগত ও নৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করার রাজনৈতিক অস্ত্রই হচ্ছে সেই শ্রেণির রাজনৈতিক দল। তাহলে, দল বলতে মার্কসবাদীরা বুঝে থাকে শ্রেণি দল যা একটা বিশেষ শ্রেণিগত বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গি এবং সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমাধানের ক্ষেত্রে বিশেষ শ্রেণির দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী চিন্তাগত প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির ওপরেই গড়ে উঠে, সে সম্বন্ধে দলের নেতা ও কর্মীরা সচেতন থাক বা না থাক, যেটা দলকে এবং দলের মূল বিচার-বিশ্লেষণকে এবং দলের নেতা ও কর্মীদের জীবনের প্রতিটি সমস্যার ক্ষেত্রে প্রাত্যহিক আচরণের সংস্কৃতিগত ও রুচিগত দিকটিকেও প্রভাবিত করে চলেছে।"

— কেন ভারতবর্ষের মাটিতে এস ইউ সি আই (সি) একমাত্র সাম্যবাদী দল

সর্বহারার মহান নেতা

কমরেড শিবদাস ঘোষ

স্মরণ দিবসে

৫ আগস্ট

সমাবেশ

প্রধান বক্তা ঃ **কমরেড প্রভাস ঘোষ,** সভাপতি ঃ কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

স্থান ঃ **নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, বেলা ৩টা**

প্রতিবাদের কণ্ঠরোধ করতে বিজেপি সরকার বেপরোয়া

এখন থেকে কোনও ব্যক্তি কোনও সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী বা সংগঠনের সাথে যুক্ত না থাকলেও তার চিন্তা সন্ত্রাসবাদের পক্ষে যাচ্ছে মনে করলেই তাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে ৬ মাস বা তারও বেশি সময় আটকে রাখতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার।

শুধু কোনও সংগঠন নয়, যে কোনও ব্যক্তিকে সন্ত্রাসবাদী বলে ঘোষণা করতে পারবে কেন্দ্রীয় সরকার। সম্প্রতি লোকসভায় বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইন সংশোধনী বিল (ইউএপিএ) সংখ্যাধিক্যের জোরে কার্যত বিনা আলোচনায় বিজেপি সরকার পাশ করিয়ে নেওয়ার পর বিষয়টি এমনই দাঁড়াচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি লোকসভায় বলেছেন, 'নিছক সমাজসেবা করলে পুলিশের কোনও আপত্তি থাকবে না, কিন্তু দরিদ্র মানুষকে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে খেপাবে যারা তাদের আমরা সহ্য করব না' (সূত্র ঃ লাইভ মিন্ট ডট কম, ২৫ জুলাই)।

এ কথা ঠিক, যে কোনও মানুষই বলবেন, সন্ত্রাসবাদ একটি ভয়াবহ বিপদ। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ফলে একদিকে সাধারণ মানুষের রক্তপাত এবং জীবনহানি যেমন ঘটে তেমনই পাশাপাশি এই কার্যকলাপকে দেখিয়ে রাষ্ট্রশক্তি সাধারণ মানুষের উপর দমন-পীড়ন নামিয়ে আনার সুযোগ পেয়ে যায়। ফলে জনমত স্বাভাবিকভাবেই সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে। আর এই অতি স্বাভাবিক জনমতেরই বিকৃত উপস্থাপনা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। তিনি যা বলেছেন, তার অর্থ দাঁড়ায় অতি উগ্র বামপন্থার নীতি বা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করেন না এমন ব্যক্তিও যদি ন্যায্য দাবিতে গড়ে ওঠা কোনও আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং সেই আন্দোলনে যদি রক্ত ঝরার সম্ভাবনা মাত্র

দুয়ের পাতায় দেখুন

স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতির দাবিতে
এএনএম নার্সদের ধর্মতলায় অবরোধ

দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের এএনএম-২ কর্মীরা তাঁদের দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে আসছেন। এই কর্মীদের উপর রাজ্যের গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা অনেকটাই নির্ভরশীল। কিন্তু এদের কাজের কোনও নিশ্চয়তা নেই। কোনও সরকারই এদের কর্মী বলে স্বীকার করে না। সামান্য বেতনে এদের বছরের পর বছর কাজ করে যেতে হয়। সরকার নির্ধারিত ছুটিও এরা পান না, এদের মেডিকেল লিভ নেই, দুর্ঘটনা ঘটলেও ছুটির ব্যবস্থা নেই। অসহনীয় এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য এরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও তাঁরা দাবিপত্র দিয়েছেন, কিন্তু কোনও ফল হয়নি।

২৬ জুলাই আবারও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেন তাঁরা। রাজ্যের সমস্ত জেলা থেকে প্রায় পাঁচ হাজার কর্মী এদিন রানি রাসমণি রোডের সমাবেশে মিলিত হন। কিন্তু সেখানেও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন গ্রহণে নানা টালবাহানা চলতে থাকে। অবশেষে এক রকম বাধ্য হয়েই হাজার হাজার স্বাস্থ্যকর্মী চৌরঙ্গী রোড অবরোধ করেন। সংগঠনের নেত্রী স্বপ্না ঘোষ ঘোষণা করেন, সরকার যতক্ষণ না তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা লিখিত আকারে দেবে, ততক্ষণ এই অবরোধ আন্দোলন চলবে। এক ঘণ্টা পর সরকারি কর্তৃপক্ষ দাবি দাওয়া পূরণ করার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন এবং অবরোধ প্রত্যাহৃত হয়।

ফ্যাসিবাদী পদক্ষেপ বিজেপি সরকারের

একের পাতার পর

থাকে, তাহলেই কেন্দ্রীয় সরকার তাকে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করে দিতে পারে। কিন্তু দেশের বেশিরভাগ জায়গায় পরিস্থিতি কি এমনই ভয়াবহ যে কোনও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের সঙ্গে সংযোগহীন ব্যক্তিকেও সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করবার দরকার হয়ে পড়েছে? বাস্তব তা বলছে না। এর আগে দেশের মানুষ দেখেছে বিজেপি সরকার কীভাবে এ দেশের যুক্তিবাদী এবং বিজেপির সমালোচক কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিল্পী, নাট্যকার থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবীদের মিথ্যা অভিযোগে জেলে ভরেছে।

লোকসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'অস্ত্র না ধরলেও বিদ্বেষ এবং সমাজের আমূল পরিবর্তন করার চিন্তা (র‍্যাডিকালিজম) সন্ত্রাসবাদের জন্ম দেয়'। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কি বিদ্বেষের রাজনীতি নিয়ে খুব উদ্বিগ্ন? বিদ্বেষ ছড়ানোর জন্য সরকারের তরফ থেকে প্রথম কাদের অভিযুক্ত করা উচিত? প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গুজরাট গণহত্যায় নিহত মুসলিমদের তাঁর গাড়ির তলায় পড়ে মরা কুকুরছানার সাথে তুলনা করেছিলেন (রয়টার্স,১২ জুলাই, ২০১৩)। ২০১৪ এপ্রিলের নির্বাচনে অমিত শাহ একাধিকবার মুসলিম বিদ্বেষী বক্তব্য রেখেছেন, তার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআরও হয়েছে (এনডিটিভি, ৭ এপ্রিল ২০১৪)। ২০১৯-এর নির্বাচনের আগেও তিনি মুসলিমদের অনুপ্রবেশকারী এবং উইপোকা বলেছেন। ক্রিশ্চান এবং মুসলিমদের দেশের বাইরে পাঠানোর হুমকি দিয়েছেন। বিজেপির সদ্য নির্বাচিত এমপি প্রজ্ঞা সিং ঠাকুর মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় অভিযুক্ত এবং তিনি মুম্বই হামলায় সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত পুলিশ অফিসার হেমন্ত কারকারের মৃত্যুকে তাঁরই কৃতিত্ব বলে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। এই দলেরই নেতা উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুসলিমদের 'সবুজ ভাইরাস' বলে সম্বোধন করেছেন। সেই উত্তরপ্রদেশেই বজরঙ্গ দল সহ নানা হিন্দুত্ববাদী সংগঠন একাধিক অস্ত্রপ্রশিক্ষণ শিবির সংগঠিত করে চলেছে (জি নিউজ, ২৫ মে,২০১৬)। এই বিদ্বেষ ছড়ানোর কারবারিদের কি কেন্দ্রীয় সরকার সন্ত্রাসবাদী বলেছে?

আইসিস, লস্কর-ই-তৈবার মতো যে সমস্ত সংগঠন ধর্মের নাম করে বিদ্বেষ ছড়ায়, তার সাথে এই সমস্ত হিন্দুত্ববাদের চ্যাম্পিয়ন সাজতে চাওয়া সংগঠন এবং ব্যক্তির কার্যকলাপের কিছু মাত্রাগত ভেদ ছাড়া আর কী পার্থক্য আছে?

অমিত শাহের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজ পরিবর্তনের কথা বলা এবং তার স্বপ্ন দেখাও সন্ত্রাসবাদ! আজ সারা বিশ্বে নিপীড়িত মানুষ এই স্বপ্ন দেখেন যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী সমাজ ভেঙে শোষণহীন সমাজ পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা হবেই। এই স্বপ্ন দেখা সন্ত্রাসবাদ! দেশে দেশে পুঁজিবাদ নিপাত যাক, সমাজতন্ত্র জিন্দাবাদ এই স্লোগান দিয়ে মানুষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাস্তায় নামছে, পুলিশের সাথে সংঘর্ষে তাদের রক্ত ঝরছে। ভারতেও মেহনতি মানুষের মধ্য থেকে এই দাবি উঠছে। এর সাথে সন্ত্রাসবাদের কোনও সম্পর্কই নেই। ষড়যন্ত্র করে বিপ্লব হয় না। এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন মার্কস-লেনিন থেকে মাও সে-তুঙয়ের মতো মহান বিপ্লবী নেতারা। উগ্র বামপন্থার নামে গরম গরম স্লোগান দিয়ে যারা কোনও কোনও জায়গায় কিছু হঠকারী এবং হিংসাত্মক কার্যকলাপ করে সেই মুষ্টিমেয় কিছু সংগঠনকে দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত বাম-গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপরই আক্রমণের খড়্গ নামাতে চাইছে। যে মহান নেতা মাও সে-তুঙের নাম জড়িয়ে বামপন্থা-গণতন্ত্রের স্বরকেই 'সন্ত্রাসবাদী', 'মাওবাদী' বলছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, সেই মাও সে-তুঙ নিজে বলেছেন— "অস্ত্রই নির্ণায়ক শক্তি... এমন তত্ত্ব লড়াই সম্বন্ধে যান্ত্রিক ধারণার ফসল। অস্ত্র গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেটাই নির্ণায়ক বিষয় নয়।... কোনও বস্তু নয়,... নির্ণায়ক শক্তি হল জনগণ। লড়াইটা শুধু সামরিক আর অর্থনৈতিক শক্তির বিরুদ্ধে নয়, লড়াইটা মানুষের শক্তির এবং নীতি আদর্শের" (মাও সে-তুঙ, অন প্রোট্র্যাক্টেড ওয়ার)।

বিজেপি নেতাদের কথায় মনে হয়, যেন কড়া আইনের অভাবেই তাঁরা পুলওয়ামা বা পাঠানকোট হামলা রুখতে পারেননি! ইউএপিএ আইন প্রথম থেকেই যথেষ্ট কড়া। তাহলে এই হামলাগুলি রোখা গেল না কেন? মিলিটারির হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতার আইন আফস্পা তো দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে চালু আছে, তাতে কাশ্মীরি যুবকদের মধ্যে ভারত সরকারের প্রতি আস্থা ফেরানো গেছে?

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথাকে খুঁটিয়ে বিচার করলে বোঝা যায়, মানুষের ন্যায্য দাবি নিয়ে গড়ে ওঠা সরকারের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলনকেই তাঁরা সন্ত্রাসবাদী কাজ বলে চালাতে চাইছেন। কারণ পুঁজিবাদী শাসন মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলিও মেটাতে পারছে না। যত দিন যাচ্ছে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। এই ক্ষোভ উপযুক্ত নেতৃত্ব পেলে যে কোনও সময় বিরাট গণআন্দোলনের আকারে ফেটে পড়তে পারে। এই আশঙ্কা তাড়া করে বেড়াচ্ছে শাসক শ্রেণিকে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপি নেতাদের কথায় মনে হয়, যেন কড়া আইনের অভাবেই তাঁরা পুলওয়ামা বা পাঠানকোট হামলা রুখতে পারেননি! ইউএপিএ আইন প্রথম থেকেই যথেষ্ট কড়া। তাহলে এই হামলাগুলি রোখা গেল না কেন? মিলিটারির হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতার আইন আফস্পা তো দীর্ঘদিন ধরে কাশ্মীরে চালু আছে, তাতে কাশ্মীরি যুবকদের মধ্যে ভারত সরকারের প্রতি আস্থা ফেরানো গেছে?

ন্যায় বিচারের নীতি বলে— আদালতে সুনিশ্চিতভাবে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও অভিযুক্তকেই অপরাধী বলা যায় না। এই নীতি শাসককে নিশ্চিত করতে বলে, একজন নিরপরাধও যেন শাস্তি না পায়। তাই রাষ্ট্রের পক্ষে অভিযোগকারীর উপরই দায় বর্তায় অভিযোগ প্রমাণ করার। কিন্তু ইউএপিএ আইন অনুসারে নিজেকে নিরপরাধ প্রমাণ করার দায় অভিযুক্তেরই। ফলে পুলিশ, সিবিআই, এনআইএ ইত্যাদি সংস্থা কাউকে একবার ইউএপিএতে অভিযুক্ত করে দিলেই সাধারণ মানুষের কোনও উপায় থাকে না এর থেকে রেহাই পাওয়ার। ফলে ইউএপিএ আইন ন্যায় বিচারের পরিপন্থী। এই আইনে ২০১৬ সালের শেষ পর্যন্ত সিবিআই, এনআইএ, পুলিশ ইত্যাদি সংস্থার দায়ের করা ৩৫৪৮টি মামলার মধ্যে গত তিন বছরে শাস্তি হয়েছে ৩১টি ক্ষেত্রে, ১১১টি মামলায় অভিযুক্তরা নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছে, আর বাকি সব মামলা ঝুলে আছে (বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮)। ফলে বিচারের অপেক্ষায় জেলে পচছে কয়েক হাজার মানুষ যাঁদের অনেকেই হয়ত নিরপরাধ বলে প্রমাণিত হবেন। বোম্বে হাইকোর্টের বর্ষীয়ান আইনজীবী মিহির দেশাইয়ের মতে, ইউএপিএ মানুষের জীবন তছনছ করে দেয় (ওই)। ১৯৬৭ সাল থেকে পরপর এমন ধরনের আইন এসেছে। এসেছে টাডা, পোটার মতো কালা আইন। ২০০৪-এ এসেছে ইউএপিএ আইনের এই দানবীয় রূপ। এই দিয়ে কাশ্মীর, মণিপুর, আসাম, কোথাও রক্তপাত কমেছে কি? মুম্বই হামলা, পাঠানকোট হামলা, উরির হামলা প্রতিরোধ করতে ব্যর্থই হয়েছে একের পর এক সরকার। অথচ লালগড় আন্দোলনে ইউএপিএ চেপেছে 'মাওবাদ'কে কোনও দিন সমর্থন না করা সাধারণ মানুষের উপরেও। এই আইন লাগু হয়েছে মহারাষ্ট্রের দলিতদের স্বার্থ নিয়ে গড়ে ওঠা ভীমা কোরেগাঁও আন্দোলনের নেতাদের উপর। কিন্তু বিজেপি-আরএসএস ঘনিষ্ঠ বেদ প্রতাপ বৈদিক পাকিস্তানে গিয়ে নিশ্চিন্তে হাফিজ সঈদের সাথে বৈঠক করে আসেন, সরকার নীরবই থাকে(এনডিটিভি, ১৫ জুলাই ২০১৪)।

একই সাথে লোকসভার পর রাজ্যসভাতেও পাশ হওয়া জাতীয় নিরাপত্তা সংস্থা (এনআইএ) সংক্রান্ত আইনের সংশোধনীতে বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন এনআইএ দেশের যে কোনও রাজ্যে যে কোনও ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালাতে পারবে, তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এবং তাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে। তার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যকে জানাতে পর্যন্ত হবে না। কোনও বিচারবিভাগীয় অনুমোদনও নিতে হবে না। আগের মতো এসপি বা ডিএসপি পদমর্যাদার অফিসাররা নয়, এখন থেকে ওই সংস্থার যে কোনও ইনস্পেকটর (পুলিশের ওসির পদমর্যাদার অফিসার) হয়ে উঠবেন যে কোনও ব্যক্তির গায়ে সন্ত্রাসবাদী তকমা লাগিয়ে দেওয়ার অধিকারী। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে বলেছেন এনআইএ কোনও পুলিশ থানা নয়, একটা বিশেষ দক্ষ সংস্থা। তাই তার কোনও আলাদা অনুমোদনের প্রয়োজনই নেই। দক্ষতার প্রশ্নই যদি তুললেন মন্ত্রী মশাই, তাহলে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভাল, এনআইএ তদন্ত করেছিল সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ, ভুয়ো সংঘর্ষে সোহরাবুদ্দিন হত্যার ঘটনায়। অথচ দোষীরা শাস্তি পেল না কেন? মালেগাঁও বিস্ফোরণে যুক্ত সাধ্বী প্রজ্ঞা ছাড়া পেয়ে গেল কেন? এই মামলায় সরকারি উকিলকে বলতে হল কেন, এনআইএ তাঁকে ধীরে চলার নির্দেশ দিয়েছে! হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে বিস্ফোরণ, সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ মামলায় বিচারককে হতাশা প্রকাশ করে বলতে হয়েছে এনআইএ-র অনিচ্ছায় কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। ফলে সব বোঝা গেলেও প্রকৃত অপরাধীকে শাস্তি দিতে বিচারব্যবস্থা অপারগ। এরপরেও মানতে হবে নরেন্দ্র মোদি-অমিত শাহরা সন্ত্রাসবাদের ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়েছেন! নাকি সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং বিরোধীদের গায়ে সন্ত্রাসবাদের তকমা লাগানোই লক্ষ্য?

দেশের নিরাপত্তা মানে কি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নয়! খুন-রাহাজানি-ছিনতাই-ডাকাতি-নারী ধর্ষণ-শিশুকন্যা ধর্ষণ বেড়ে চলেছে। কোথায় তাদের নিরাপত্তা? আইনের তো অভাব নেই, কী করছে সরকার? বিদেশি শক্তি কিংবা কিছু মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসবাদী যদি কিছু করার চেষ্টাও করে, তা রোখার প্রকৃত গ্যারান্টি কি নিছক কিছু কড়া আইন না দেশের জনগণ! সেই জনগণকে সরকার কী অবস্থায় রেখেছে? নানা সমস্যায় জর্জরিত মানুষ আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক দিক থেকে কি নিরাপদে রয়েছেন? একের পর এক গণপিটুনিতে হত্যা করা হচ্ছে না দেশের অগণিত অসহায় নিরপরাধ মানুষকে? জাত-পাত-সম্প্রদায়ের বিভেদ ছড়িয়ে খুন করা হচ্ছে না শত শত মানুষকে? কোনও বিষয়ে সরকারের সাথে দ্বিমত পোষণ করলেই দেগে দেওয়া হচ্ছে না দেশদ্রোহী বলে? জেলে পুরে বিচারের নামে প্রহসন চলছে না? দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুললে এমনকি বিচারপতিকে খুন করা হচ্ছে না? মানুষের নিরাপত্তা কোথায়!

কংগ্রেসও আজ এসবের জোরালো বিরোধিতা করতে পারছে না। কারণ, ২০০৯ সালে মুম্বই হামলার অজুহাতে মনমোহন সিংহ সরকারের আমলে এনআইএ গঠিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালে ইন্দিরা গান্ধীর আমলেই ইউএপিএ-র মতো কালা কানুন চালু হয়েছিল। সমস্ত রকম গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনার গলা টিপে ধরতেই সেগুলি বেশি কাজে লেগেছে। ফলে তারাও ধোয়া তুলসীপাতা নয়। বস্তুত আজ ব্যক্তি স্বাধীনতাকে এভাবেই দুপায়ে মাড়িয়ে যাচ্ছে সারা দুনিয়ার পুঁজিবাদী সরকারগুলি। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। যে সন্ত্রাসবাদকে লালনপালন করছে সাম্রাজ্যবাদী দুনিয়ার শিরোমণি আমেরিকা-ব্রিটেন, তাদের নানা এজেন্টের হাত ধরেই সন্ত্রাসবাদীরা অস্ত্র পায়। ভারতেও দেখা গেছে সেই কংগ্রেসের আমল থেকেই সন্ত্রাসবাদীদের হাতে অস্ত্র কিংবা অর্থ সরবরাহ সরকার কোনও দিন বন্ধ করতে পারেনি, হয়ত বা চায়নি। বিজেপি আমলেও অটল বিহারি বাজপেয়ীর পাঁচ বছরে মাসুদ আজাহারদের যেমন রোখা যায়নি, নরেন্দ্র মোদির বীরত্বের আস্ফালনেও সন্ত্রাসবাদ আদৌ আটকায়নি। অস্ত্রশস্ত্র কিংবা টাকা অথবা অন্যান্য সাহায্য তারা ঠিকই পেয়েছে। অথচ দেশের সাধারণ মানুষর উপর এই অজুহাতে নানা দমনমূলক ব্যবস্থা নেমে এসেছে। খর্ব হয়েছে একের পর এক গণতান্ত্রিক অধিকার। আফস্পার নামে গোটা কাশ্মীরের জনগণকেই সরকার সন্দেহভাজন বানিয়ে ছেড়েছে। মণিপুরের মায়েরা নগ্ন হয়ে নিজের দেশের মিলিটারির বিরুদ্ধেই মিছিল করতে বাধ্য হয়েছেন।

অশিক্ষায় জর্জরিত ছাত্র, বেকারিতে দুর্দশাগ্রস্ত যুবক, ফসলের দাম না পাওয়া চাষি, ছাঁটাই হওয়া শ্রমিক— শিক্ষা-কাজের অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুললেই শাসকরা বছরের পর বছর বলেছে এসব সমস্যার সামনে সন্ত্রাসবাদই বাধা। যত দিন যাচ্ছে, মালিক শ্রেণির সংকট যত বাড়ছে তত চলছে গণতন্ত্র হরণের প্রচেষ্টা। যাতে সন্ত্রাসবাদকে দেখিয়ে মানুষের ন্যায্য আন্দোলনকেও দমিয়ে রাখা যায়। তাই নরেন্দ্র মোদি সরকারের ব্যক্তির অধিকার হরণের এত ভয়ঙ্কর পরিকল্পনা। এমনকী যাতে কেউ এই বিলগুলির মৌখিক বিরোধিতাও না করতে পারে, সেজন্য বিজেপি সভাপতি হুঁশিয়ারি দিয়েই রেখেছেন, যারা বিরোধিতা করবে তারাই সন্ত্রাসবাদের সমর্থক বলে গণ্য হবে। গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে মারার এই সর্বনাশা আইন রুখতে সর্বস্তরের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকেই আজ এগিয়ে আসতে হবে।

সাংসদদের বেতন বাড়ে লাখ টাকা শ্রমিকদের বেলায় ২ টাকা

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের শ্রমমন্ত্রী ২৩ জুলাই দেশের শ্রমিক-কর্মীদের জন্য ন্যূনতম বেতন ঘোষণা করেছেন। মাসে ৪,৬২৮ টাকা। দৈনিক ১৭৮ টাকা। ২০১৭ সালের থেকে মাত্র ২ টাকা বেশি। গত দু'বছরে যা মূল্যবৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় মন্ত্রীর এই ঘোষণার দ্বারা বাস্তবে শ্রমিকদের বেতন বাড়ল না, অনেকটা কমল।

কিন্তু কীসের ভিত্তিতে সরকার শ্রমিকদের জন্য এমন এক অবিশ্বাস্য বেতন কাঠামো ঘোষণা করল? সুপ্রিম কোর্ট একটি মামলার রায়ে জানিয়েছিল দৈনিক ২৭০০ ক্যালরি খাবারের প্রয়োজন হিসেব করে ন্যূনতম মাসিক বেতন ঠিক হওয়া উচিত। সেই অনুযায়ী ২০১৬ সালে সপ্তম বেতন কমিশন হিসেব করে শ্রমিকদের ন্যূনতম বেতন সুপারিশ করেছিল ১৮,০০০ টাকা। গত বছর জানুয়ারিতে মোদি-১ সরকারের শ্রমদপ্তরের তত্ত্বাবধানেই এক বিশেষজ্ঞ কমিটি নিযুক্ত হয়েছিল। সেই কমিটি শ্রমিকদের জন্য দিনে ২৪০০ ক্যালরি শক্তিসম্পন্ন খাবারের কথা বিবেচনা করে দৈনিক ৩৩৫ টাকা থেকে ৪৪৭ টাকা, অর্থাৎ মাসিক ৯৭৫০ টাকা থেকে ১১,৬২২ টাকা মজুরির প্রয়োজন সুপারিশ করেছে। বেতন কমিশন কিংবা সরকারের নিজস্ব বিশেষজ্ঞ কমিটি কারও সুপারিশই বিজেপি সরকারের মন্ত্রীরা মানলেন না।

অথচ এই সরকারই তো মন্ত্রী কিংবা সাংসদদের মাইনে বাড়াতে এতটুকুও ইতস্তত করেনি। একজন এমপি-র মূল বেতন ছিল ৫০ হাজার টাকা। ১ লাখ টাকা। নানা সুবিধা সহ তাঁরা পান মাসে ২ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা। লোকসভায় ৫৪২ জন সাংসদের মধ্যে ৪৭৫ জনই কোটিপতি। এর মধ্যে বহু কোটি টাকার মালিক রয়েছেন বহুজন। তবু তাঁদের মাইনে বাড়ছে। এই সরকারই এবারের বাজেটে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের জন্য কর্পোরেট ট্যাক্সে দেদার ছাড় ঘোষণা করেছে, ব্যাঙ্কে পুঁজিপতিদের না মেটানো ঋণ মিটিয়ে দিতে ৭০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। অথচ সমস্ত সম্পদের স্রষ্টা শ্রমিকদের জন্য সরকার মজুরি বাড়ালো মাত্র ২ টাকা।

দেশের শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষকে কতখানি হীন চোখে দেখলে, তাদের সম্পর্কে কতখানি নির্মম এবং নির্লজ্জ হলে একটি সরকারের মন্ত্রীরা এমন কাজ করতে পারে!

রিলায়েন্স-প্রধান মুকেশ আম্বানি মাসে কত টাকা বেতন বাবদ নেন? ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। দিনে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ৬৬৭ টাকা। তাঁর দুই তুতো ভাইকে দিচ্ছেন দিনে যথাক্রমে ৫ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৭১ এবং ৫ লক্ষ ৬৩ হাজার ৫৬১ টাকা। আর রিলায়েন্সের ঠিকা কর্মীরা, যাঁদের হাড়-চামড়া এক করে আম্বানিরা দেশের সেরা ধনকুবেরে পরিণত হয়েছেন, তাঁরা কত টাকা মাইনে পান? তাঁদের জন্য বরাদ্দ ওই ১৭৮ টাকা। আচ্ছা, শ্রমিকদের জন্য সরকারের এই অবিশ্বাস্য রকমের কম মাইনে ঘোষণার সাথে রিলায়েন্সদের পুঁজির পাহাড়ের কি কোনও সম্পর্ক আছে? আছে। বাস্তবে দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক গভীর। আপাতদৃষ্টিতে তা অনেকসময় চোখে পড়ে না।

প্রথমত, যে বিজেপি সরকার শ্রমিকদের মাইনে দু'বছরে মাত্র দু'টাকা বাড়ায়, তারাই নির্বাচনে খরচ করে ২৭ হাজার কোটি টাকা, যার অঘোষিত পরিমাণ দু'লক্ষ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ টাকা এল কোথা থেকে? জনগণের থেকে চাঁদা হিসাবে তো তারা নেয়নি। তা হলে? এল ধনকুবের একচেটিয়া পুঁজিপতিদের থেকে। আম্বানি, আদানি, টাটা, বিড়লা, গোয়েঙ্কা, মাহিন্দ্রা প্রভৃতি দেশের একচেটিয়া পুঁজিপতিরাই এর জোগানদার। তারা কেন বিজেপিকে টাকা জোগায়? জোগায় এই কারণে যে, নির্বাচনে জিতে তাদের স্বার্থই এরা দেখবে— এটা অলিখিত চুক্তির শর্ত। শ্রমিকদের জন্য এই অবিশ্বাস্য কম মাইনে ঘোষণা ঠিক এই শর্তেরই অঙ্গ। সরকার এই ঘোষণার দ্বারা পুঁজিপতিদের বুঝিয়ে দিল তাদের যথেচ্ছ শ্রমিক শোষণে সরকার বাধা দেবে না। বরং সরকার তাতে সম্মতিই দিচ্ছে। মালিকরা তাদের ইচ্ছামতো কম মাইনে শ্রমিকদের দিতে পারে। নয়া উদারনীতিবাদের সমর্থক বিজেপি সরকারও মালিকদের সাথে একই মত পোষণ করে যে, শ্রমিকদের জন্য খরচকে একেবারে ন্যূনতম পরিমাণে নিয়ে গিয়েই উৎপাদন এবং বৃদ্ধিকে চাঙ্গা করা যেতে পারে, মালিকদের মুনাফা আরও বাড়তে পারে।

ভারত একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র। সরকারের মন্ত্রীরা পুঁজিপতি শ্রেণির রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে। এই সত্যটা দেশের মানুষের থেকে, শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের থেকে আড়াল করতে, তাদের চোখে ধুলো দিতে শাসকরা স্লোগান তোলে সব কা সাথ, সব কা বিকাশ। কারণ বাস্তবে এই বিকাশে মালিকদের মুনাফা আকাশ ছুঁয়ে যায়, আর সেই মুনাফার স্রষ্টা শ্রমিকদের পরিবারে দু'বেলা পেট ভরানোর মতো অন্নটুকুও জোটে না।

সরকারের এই মনোভাবই প্রকাশ পেয়েছে মন্ত্রীর আর এক ঘোষণায়। এতদিন শ্রমিকদের জন্য যতটুকু অধিকার, সুযোগ এবং সুবিধা ছিল সেটুকুকেও বিসর্জন দিয়ে সরকার মালিকদের হাতে এক তরফা শ্রমিক শোষণের অধিকার তুলে দিতে চলেছে। তাই তারা ঘোষণা করেছে শ্রম আইনের মোট ৪২টি ধারাকে ৪টিতে সংকুচিত করে আনবে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সব কিছুকেই বিজেপি নেতাদের 'কর্পোরেট ঋণ শোধ' বলেই দেখছেন সচেতন মানুষ। কিন্তু শোষিত, নিপীড়িত শ্রমিক-কৃষক-সাধারণ মানুষের যে অংশটি বিজেপি নেতাদের মুখের বক্তৃতায় আর স্লোগানে ভুলে ভেবেছিলেন যে, এই নেতারা তাঁদের জীবনে আচ্ছে দিন নিয়ে আসবেন, এই সরকারের একের পর এক পদক্ষেপে তাঁদের সেই ভুল দ্রুত ভেঙে যাচ্ছে। প্রতিদিন এটা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শোষিত মানুষের ধর্ম যা-ই হোক, বর্ণ যা-ই হোক, তাতে মালিকদের, পুঁজিপতি শ্রেণির কিংবা তাদের রাজনৈতিক ম্যানেজার হিসাবে কাজ করা সরকারি মন্ত্রীদের চাপানো শোষণের মাত্রা, করের বোঝা, মূল্যবৃদ্ধির বোঝা এতটুকুও কমে না। বরং শোষিত-নিপীড়িত মানুষকে ধর্মে-বর্ণে-সম্প্রদায়ে বিভক্ত করে শোষণ-নিপীড়নের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিরোধের শক্তিকেই দুর্বল করে দেয়।

সরকারি নীতি ও দায়বদ্ধতার অভাবেই মেট্রো রেল আজ পাতাল আতঙ্ক

কলকাতা মেট্রো রেলে যাত্রী পরিষেবার মান যে কত তলানিতে পৌঁছেছে, সম্প্রতি দরজায় হাত আটকে সজল কাঞ্জিলালের মর্মান্তিক মৃত্যু তা আবারও সামনে এনে দিল। ১৩ জুলাই দরজায় হাত আটকে মারা যান সজলবাবু। তখনই প্রশ্ন উঠেছে কেন দরজার সেন্সর কাজ করলো না? কোনও হেল্পলাইন ফোন নাম্বার কাজ করলো না কেন? ট্রেনের রেকগুলির যথাযথ স্বাস্থ্য পরীক্ষা অবহেলিত কেন? সিসিটিভি ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে যে ওই ব্যক্তি বাইরে ঝুলছেন অথচ তা মেট্রোর কোনও কর্মচারীর নজরে এল না কেন? তাহলে নজরদারি কোথায়?

প্রতিদিন গড়ে সাত লাখ যাত্রী যাতায়াত করেন কলকাতা মেট্রোয়। প্রায়শঃই তারা কোনও না কোনও সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। কখনও মাঝপথে খারাপ হয়ে যাচ্ছে রেক। কখনও আলো, পাখা, এসি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কখনও ড্রেনের জল উঠে আসছে লাইনে, ধরা পড়ছে ফাটল, গেট খোলা রেখেই চলতে শুরু করছে ট্রেন। কখনো 'বার্নিং ট্রেনের' মতো আগুন লাগা কামরা নিয়ে সুড়ঙ্গ পথে দৌড়াচ্ছে মেট্রো। ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে কামরা, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচতে কামরার ভেতর থেকে যাত্রীরা ঝাঁপ দিচ্ছেন বাইরে। আর অফিস টাইমে লাগাতার ট্রেন বাতিল এবং সময়ে ট্রেন না চলার অভিযোগ তো রয়েইছে। এই সমস্ত সমস্যা নিয়ে মেট্রো কর্তৃপক্ষ এবং কেন্দ্রীয় সরকার কার্যত উদাসীন। কোনও ঘটনা ঘটলে একটা তদন্ত কমিটি গঠন করে বড়জোর কিছু কর্মীকে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে অথবা বিবৃতি দিয়ে দায় সারছেন তাঁরা। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বুঝিয়ে দিচ্ছে কলকাতা মেট্রোয় কখন কী ঘটবে, কার জীবনে বিপদ নেমে আসবে কেউ জানে না! তাই কলকাতার মেট্রো রেল আজ পাতাল আতঙ্কে পরিণত হয়েছে। কিন্তু কেন এমন হল?

রেক সমস্যা

নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত দূরত্ব প্রায় ২৮ কিলোমিটার। কলকাতা মেট্রোতে এখন ১৬টি এসি আর ১৪টি নন এসি রেক আছে। এরমধ্যে বেশ কয়েকটি সেই জন্মলগ্ন থেকে যাত্রী পরিবহন করে করে ক্লান্ত। রেক রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার থেকে জোড়াতালি দিয়ে মেরামত করে এলেও প্রায়শই তারা বিকল হয়। এসি রেক নিয়ে রয়েছে নানা সমস্যা। সেগুলি খারাপ হলে চটজলদি ঠিক করার মতো মেকানিক পাওয়া যায় না। তাই প্রতিদিন গড়ে ২০-২২টি রেক পাওয়া যায়। লক্ষ লক্ষ যাত্রীর চাপ সামাল দেওয়ার জন্য যেখানে ট্রেনের সংখ্যা বাড়ানো দরকার সেখানে এখন দৈনিক ৩০০টির জায়গায় ২৮৪টি ট্রেন চালানো হচ্ছে।

যে রেকে সজলবাবুর প্রাণহানির ঘটনাটি ঘটে তা নাকি চেন্নাইয়ের অত্যাধুনিক কারখানা ইন্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি থেকে আনা। 'মেধা প্রযুক্তি' যুক্ত এইরকম তিনটি রেক আসে ২০১৭ জুলাইয়ে। গত দু'বছর ধরে ট্রায়াল রানে ডাহা ফেল করা এই রেকগুলিতে ধরা পড়ে নানা ত্রুটি। স্বয়ংক্রিয় দরজা কাজ না করা, থার্ড রেলের সঙ্গে ঠিকমতো সংযোগ স্থাপন না হওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহে বিঘ্ন ঘটা, বাঁকের জায়গায় দাঁড়িয়ে যাওয়া সহ একাধিক ত্রুটি। তা সত্ত্বেও এই ত্রুটিপূর্ণ রেকগুলি দিয়েই প্রতিদিন মানুষের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে মেট্রো চালানো হচ্ছে কেন? তাহলে কি যাত্রীদের প্রাণের কোনও মূল্য কর্তৃপক্ষের কাছে নেই? প্রতিদিন মেট্রো রেকগুলিকে চালানোর আগে পরীক্ষা করে ফিট সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। প্রশ্ন উঠছে ওই দিন ত্রুটিপূর্ণ ওই রেকটি ফিট সার্টিফিকেট পেল কী করে?

প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি বদল অবহেলিত

যাত্রীর চাপ সামলে নিরাপদ পরিষেবার জন্য প্রয়োজন আধুনিক রেক, সিগন্যাল ব্যবস্থা সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর দ্রুত বদল, না হলে ভবিষ্যতে বরাহনগর, দক্ষিণেশ্বর, বিমানবন্দর রুটে মেট্রো চালু হলে পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যেতে পারে। অথচ কলকাতা মেট্রোকে আই সি এফ এর তৈরি ত্রুটিপূর্ণ রেক ব্যবহার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। কলকাতা মেট্রোয় এই সংস্থা থেকে যে রেকগুলি এসেছে তার মধ্যে দুটি মেরামতের জন্য ফেরত পাঠানো হয়েছে আর একটিতে গত ১৩ জুলাইয়ের দুর্ঘটনা ঘটে। যেখানে উন্নত মানের ডি এম ইউ ট্রেন শ্রীলঙ্কায় রপ্তানি করে সরকার কোটি কোটি টাকা আয় করছে সেখানে কলকাতা মেট্রোয় জনসাধারণের জন্য নিম্নমানের ত্রুটিপূর্ণ রেক কেন? আধুনিক সিগন্যাল প্রযুক্তির যে প্রস্তাব এসেছে তাও আটকে আছে কোন স্বার্থে? বিশেষজ্ঞদের ধারণা, তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ নির্ভর ব্যবস্থা চালু হলে একদিকে যেমন ট্রেন সার্ভিসের সময় কমবে, যাত্রীর সংখ্যা বাড়বে তেমনি যাত্রী সুরক্ষা অনেকটা সুনিশ্চিত হবে। একটি হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২০১৮-র ১ এপ্রিল থেকে ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত কলকাতা মেট্রোর আয় বেড়েছে প্রায় ৪.৩২ শতাংশ। আয় বৃদ্ধি হলেও পরিষেবার মান কিন্তু বাড়েনি।

অপর্যাপ্ত কর্মীসংখ্যা

সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন দক্ষ ও পর্যাপ্ত সংখ্যক কর্মী। কিন্তু সেই কর্মী সংখ্যার অভাবে ভুগছে কলকাতা মেট্রো। এই মুহূর্তে সুষ্ঠু পরিষেবা দেওয়ার জন্য সব মিলিয়ে মোট ২৫৯ জন ড্রাইভার প্রয়োজন। অথচ মেট্রোর হাতে রয়েছে মাত্র ১৯২ জন। ঘাটতি ৬৭ জন। আরও আশ্চর্যের বিষয় ওই ১৯২ জনের মধ্যে ১০০ জন পূর্ব, দক্ষিণ-পূর্ব রেল থেকে ধার করা। অথচ মেট্রো রেল চালানোর পদ্ধতিটাই আলাদা। ধার করে নিয়ে আসা ড্রাইভারদের নামমাত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে যাত্রীদের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে চালানো হচ্ছে মেট্রো রেল। দুর্ঘটনার দিন এইরকমই এক ড্রাইভার নাকি ট্রেনটি চালাচ্ছিলেন বলে সংবাদে প্রকাশ। শুধু মোটরম্যান নয়, প্রতিটি বিভাগেই বহু পদ শূন্য। সিগন্যালিং অ্যান্ড ট্রাফিক বিভাগে প্রায় ৪৬ শতাংশ কর্মী নেই। ইলেকট্রিক্যাল বিভাগে ৪৩৫টি পদ শূন্য। এইরকম স্টোর, অ্যাকাউন্টস স্মার্ট কার্ড, টিকিট কাউন্টার, টোকেন গেট সহ সব বিভাগেই একই অবস্থা। যারা কাজ করছেন তাদের বেশিরভাগ হয় অস্থায়ী না হয় ভাড়া করা। শুধু কর্মীরা নন, মেট্রো রেলের কর্তারাও অস্থায়ী। তাঁরাও বছর দুয়েক পরপর অন্য জোনে বদলি হয়ে যান। বস্তুত এই ভাবেই দিনের পর দিন চলছে কলকাতা মেট্রো। যে কোনও দিন আরও বড় বিপর্যয় ঘটতে পারে। কেন মেট্রো রেলের এইসব

ছয়ের পাতায় দেখুন

মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের সম্মেলন

কেশিয়াড়ি ঃ মোটরভ্যানের স্থায়ী সরকারি লাইসেন্স প্রদান, দুর্ঘটনাজনিত বিমা চালু, চালকদের পরিবহণ শ্রমিকের স্বীকৃতি সহ ৭ দফা দাবিতে ২১ জুলাই সারা বাংলা মোটরভ্যান চালক ইউনিয়নের কেশিয়াড়ি ব্লক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল পশ্চিম মেদিনীপুরে। উপস্থিত ছিলেন শতাধিক চালক। জেলা সম্পাদক রবিশঙ্কর রাউল বলেন, ২০০৫ সাল থেকে মোটরভ্যান চালকেরা স্থায়ী সরকারি লাইসেন্সের দাবি করে আসছেন। বহু আন্দোলনের ফলে সরকার অস্থায়ী পরিচয় নম্বর দিলেও তা সংখ্যায় অনেক কম। উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়নের রাজ্য কমিটির সদস্য জগদীশ শাসমল, এআইইউটিইউসি জেলা কমিটির সদস্য পূর্ণচন্দ্র বেরা। আশিস রানাকে সম্পাদক, স্বপন রানাকে সহ সম্পাদক করে ১৮ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

বাদুড়িয়া ঃ উত্তর চব্বিশ পরগণার বাদুড়িয়ায় মোটরভ্যান চালকদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। চালক পলাশ হাজারির সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা, উপদেষ্টা পিয়ার আলি, সহ সভাপতি অজয় বাইন, আহ্বায়ক নিতাই পাল, কৃষক নেতা দাউদ গাজি প্রমুখ। সম্মেলন থেকে ১৫ জনের কমিটি গঠিত হয়।

স্বরূপনগরে নির্মাণ কর্মী সম্মেলন

পরিচয়পত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা দূর করা, এস এস ওয়াই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তিকরণ, বেনিফিট, পেনশন ইত্যাদি দাবিতে ২০ জুলাই উত্তর ২৪ পরগণার স্বরূপনগরে অনুষ্ঠিত হয় এ আই ইউ টি ইউ সি অনুমোদিত সারা বাংলা নির্মাণ কর্মী ইউনিয়নের দ্বিতীয় ব্লক সম্মেলন। বক্তব্য রাখেন জেলা সভাপতি প্রদীপ চৌধুরী, বসিরহাট মহকুমা সম্পাদক অজয় বাইন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন শ্রমিক নেতা জয়ন্ত সাহা। অজিত মণ্ডলকে সভাপতি ও ছটু মির্জাকে সম্পাদক করে ১৫ জনের স্বরূপনগর ব্লক কমিটি নির্বাচিত হয়।

সেভ এডুকেশন কমিটির অবস্থান ডি আই দপ্তরে

খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতিতে ভালো ভালো কথার আড়ালে শিক্ষায় মারাত্মক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে। এর ফলে ধ্বংস হয়ে যাবে ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা। শিক্ষার স্বাধিকার, গণতান্ত্রিক পরিচালনব্যবস্থার যতটুকু অবশিষ্ট আছে তাও ধ্বংস হবে। ২৪ জুলাই কলকাতা ডি আই দপ্তরে শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষানুরাগী মানুষের এক বিক্ষোভ অবস্থানে একথা বলেন অল বেঙ্গল সেভ এডুকেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক কার্তিক সাহা।

অবস্থানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কলকাতা জেলা সম্পাদক স্বপন চক্রবর্তী, শিক্ষক নেতা আশিস বসু, তপতী মিত্র, অমিয় জানা, শম্পা সরকার, অধ্যাপক দেবব্রত বেরা, লেখক সুপ্রতীপ দেবদাস, শিক্ষিকা কুহু ভট্টাচার্য, অঞ্জলি পালিত প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক নেতা শুভঙ্কর ব্যানার্জী। বক্তারা সকলেই আর কালক্ষেপ না করে দ্রুত প্রথম শ্রেণি থেকে পাশ-ফেল চালু ও খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানান। আগামী ২১ আগস্ট ভারত সভা হলে সেভ এডুকেশন কনভেনশন সফল করার আহ্বান জানানো হয়।

৪ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল ডি আই (মাধ্যমিক)-এর সাথে দেখা করে রাজ্যপালের উদ্দেশে এক স্মারকলিপি তাঁর হাতে তুলে দেন।

কলকাতায় ডাঃ কাফিল খান

কনভেনশনে বিপুল সমাগম

ডাঃ কাফিল আহমেদ খানের কথা মনে পড়ে? ২০১৭ সালের ঘটনা। উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরে বিআরডি মেডিকেল কলেজের শিশুবিভাগের অধ্যাপক ডাঃ কাফিল খানকে যোগী আদিত্যনাথ সরকার বরখাস্ত করে জেলে পুরেছিল। ক্ষমতাসীন বিজেপি সরকার এই হাসপাতালে অক্সিজেন সরবরাহকারী সংস্থার টাকা না মেটানোয় তারা সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে সরকারি হিসাবে ৭০টি শিশুর মৃত্যু সারা দেশে বিজেপিকে প্রবল সমালোচনার মধ্যে ফেলেছিল। সেই সময় ডাঃ কাফিল খান নিজস্ব টাকা খরচ করে কয়েকশো অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবস্থা করে কোনওক্রমে পরিস্থিতি সামাল দেন। বাস্তবে তাঁর ভূমিকার জন্যই বহু শিশুর প্রাণ বাঁচে এবং সরকারি অব্যবস্থার দিকটি প্রচারে আসে। এই অপরাধে সরকার তাঁকে গ্রেপ্তার করে ৯ মাস কারাগারে আটকে রাখে।

সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট তাঁর সাসপেনসন সম্পর্কিত তদন্ত ৯০ দিনের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকারকে। তদন্ত কী হবে ভবিষ্যৎই বলবে। কিন্তু তাঁর পরিবার আজও প্রবল হুমকির মুখে।

ডাঃ কাফিল খানের ওপর থেকে সাসপেনশন ও সমস্ত চার্জ প্রত্যাহারের এবং চিকিৎসক ও কর্মীদের ওপর প্রশাসনিক সন্ত্রাস বন্ধের দাবিতে ২২ জুলাই কলকাতার রোটারি সদনে নাগরিক কনভেনশন আহ্বান করে মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার।

সভায় উপস্থিত হয়ে ডাঃ কাফিল খান বলেন, আমি শুধু একজন মুসলিম বলে নয়, যে কোনও ডাক্তার আজ ভারতবর্ষে যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেন তাঁর পরিণতি হবে আমারই মতো। অপর্ণা সেন বলেন, "ভারতবর্ষে এমন সরকার চলছে যারা মানবশিশুকে বাঁচানোর প্রয়োজন মনে করে না, গোরুর প্রাণ বাঁচানোর জন্য মরিয়া।" ডাঃ বিনায়ক সেন বলেন, "সিভিল সোসাইটিরই দায়িত্ব ভারতবর্ষে জাতপাত-ধর্মের নামে যে অন্যায় চলছে তার প্রতিবাদ করা"। ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, "ভারতবর্ষে সংবিধান স্বীকৃত স্বাস্থ্যের মৌলিক অধিকারকে অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন ডাঃ উদয় নারায়ণ সরকার (প্রখ্যাত কার্ডিও-থোরাসিক সার্জেন), অ্যাডভোকেট পার্থসারথি সেনগুপ্ত (কলকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত আইনজীবী), ডাঃ অশোক সামন্ত প্রমুখ।

মদ বিরোধী আন্দোলন মালদা জেলাতেও ছড়াল

মালদা জেলার সাদুল্লাপুর মহাশ্মশানের লাগোয়া গ্রামে মন্দির ও প্রাথমিক স্কুলের কাছে একটি মদের দোকান খোলা হলে গ্রামবাসীরা এর প্রতিরোধে নামেন এবং 'সাগরদিঘি পার্বত্য সাদুল্লাপুর মদ বিরোধী কমিটি' গড়ে আন্দোলনে সামিল হন। কমিটির সভাপতি ঝুমা রায়ের নেতৃত্বে শত শত গ্রামবাসী মদের দোকান বন্ধের দাবিতে পঞ্চায়েত প্রধান, বিডিও, থানার আইসি, আবগারি দপ্তর ও শেষ পর্যন্ত ডিএম-কে স্মারকলিপি দেন। এলাকায় প্রতিবাদ সভা, মিটিং-মিছিল চলতে থাকে। আন্দোলনের চাপে ইংলিশ বাজার বিডিও-র তত্ত্বাবধানে পঞ্চায়েত প্রধানের উপস্থিতিতে মদের দোকান বন্ধের সিদ্ধান্ত হয়।

কিছুদিন পর আবার মদ বিক্রি শুরু হলে আবারও এলাকা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। কমিটির নেতৃত্বে সাদুল্লাপুর ফাঁড়িতে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। শতাধিক গ্রামবাসী বিডিও দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। আন্দোলন চলাকালীন মালিক নানাভাবে আন্দোলনকারীদের হেনস্থা করে, প্রাণে মারার হুমকি দেয়। কিন্তু পুলিশ তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধেই মিথ্যা মামলা দায়ের করে। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষ গর্জে ওঠে এবং ২১ জুলাই হাজার খানেক মানুষের মিছিল ও প্রতিবাদ সভা হয়। বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মহেশ্বর ভট্টাচার্য, সমাজকর্মী মল্লিকা সরকার, নাট্যকার তৃপ্তি সাহা, সমাজসেবী গৌতম সরকার ও আদর্শ মিশ্র এবং কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন ঝুমা রায়, কানন রবি দাস প্রমুখ। কমিটি মনে করে আন্দোলনের চাপ না থাকলে আবার মদ বিক্রি শুরু হবে।

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতির দাবি

পরিচারিকাদের শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি, প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম মজুরি প্রদান, সপ্তাহে একদিন ছুটি এবং প্রতি বছর বোনাস প্রদান, সামাজিক সুরক্ষা যোজনার সুবিধা, সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অন্তর্গত পরিচারিকারা যাতে শিক্ষা-স্বাস্থ্য সহ সমস্ত বৈধ অধিকার বিনা বাধায় পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করা প্রভৃতি দাবিতে সারা বাংলা পরিচারিকা সমিতির পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির উদ্যোগে ২৩ জুলাই উপ-শ্রম অধ্যক্ষ, খড়্গপুর অফিসে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সংগঠনের জেলা নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কমসোমলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিবির

কিশোর সংগঠন কমসোমলের পক্ষ থেকে ১৭-১৯ জুলাই ঘাটশিলায় মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষ চিন্তাধারা শিক্ষাকেন্দ্রে সারা বাংলা রাজ্য প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ১৭ জুলাই বিকালে রক্তপাতাকা উত্তোলন, সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ এবং শহিদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে শিবিরের সূচনা হয়। প্যারেড, পিটি, ড্রিল প্রশিক্ষণ সহ গান আবৃত্তিতে অংশ নেয় আগত সদস্যরা। একটি সিনেমাও প্রদর্শিত হয়। এ ছাড়াও এসইউসিআই(সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের 'কিশোরদের প্রতি' বইটি পড়ে তার ভিত্তিতে নির্বাচিত কিছু প্রশ্নের উপর আলোচনায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেয় ৬১ জন কমসোমল সদস্য। শেষ অধিবেশনে সমস্ত প্রশ্নের ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু।

উপস্থিত ছিলেন এস ইউ সি আই (সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সান্টু গুপ্ত, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও এ আই ডি এস ও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড কমল সাঁই, সর্বভারতীয় সম্পাদক কমরেড অশোক মিশ্র, রাজ্য সম্পাদক কমরেড সৌরভ ঘোষ। আগত ১৭৪ জন প্রতিনিধি শিবির শেষ করে ফিরে যায় গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে।

সাঁওতালডিতে সেচের জলের দাবি

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর-২ ব্লকের সাঁওতালডি এবং সংলগ্ন চেলিয়ামা অঞ্চলে দামোদর ও তার উপনদী গোয়াই সহ অসংখ্য ছোট নদী ও জোড় থাকা সত্ত্বেও এই সমস্ত এলাকা খরায় জ্বলছে। এই সমস্যা সমাধানের দাবিতে ২২ জুলাই এস ইউ সি আই (সি) সাঁওতালডি লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে রঘুনাথপুর-২ বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হয়। শতাধিক মানুষের এই বিক্ষোভ থেকে দাবি ওঠে— নদী এবং জোড়গুলি থেকে পাম্পের সাহায্যে সারা বছর সেচ ও পানীয় জল সরবরাহের স্থায়ী ব্যবস্থা করতে হবে। আরও দাবি ওঠে ১০০ দিনের কাজ দিতে না পারলে সমপরিমাণ মজুরি দিতে হবে। জয়েন্ট বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দিয়ে নেতৃবৃন্দ এই দাবিগুলির পাশাপাশি মদ নিষিদ্ধ করা, জব কার্ড সুষ্ঠুভাবে প্রদান, রাস্তাঘাট নির্মাণ,বার্ধক্যভাতা ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বণ্টনে দুর্নীতি বন্ধ করার দাবি জানান।

আন্দোলনের চাপে ক্যানিংয়ে রাস্তার দাবি আদায়

প্রশাসন একাধিকবার ক্যানিং-এর আমতলা স্কুল সংলগ্ন রাস্তা তৈরির প্রতিশ্রুতি দিলেও তা রক্ষা করেনি। দাবি আদায়ে এলাকার মানুষ তৈরি করেছেন নাগরিক ঐক্য মঞ্চ। মঞ্চের নেতৃত্বে ১৬ জুলাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবকরা ঢোসা যামিনী মোড়ে রাস্তা অবরোধ করেন। এরপরেও প্রশাসন কিছু না করায় পরদিন সকাল ৬ টা থেকে স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী এবং আশেপাশের গ্রামের কয়েকশো মানুষ রাস্তা অবরোধ শুরু করেন। পুলিশ অবরোধ তুলে দেওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও অনমনীয় দৃঢ়তায় সাধারণ মানুষ ও ছাত্র-ছাত্রীরা অবরোধ চালিয়ে যান। শেষপর্যন্ত বিকাল ৩ টায় রাস্তার ওয়ার্ক অর্ডার হাতে নিয়ে বিডিও এবং সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদের আধিকারিকরা উপস্থিত হন।

৫ দিনের মধ্যে তাঁরা রাস্তা তৈরি শুরুর প্রতিশ্রুতি দেন। এই আন্দোলনের জয়ে মানুষকে অভিনন্দন জানিয়ে জনস্বার্থ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান মঞ্চের নেতৃবৃন্দ।

মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নারায়ণগড় ব্লক সম্মেলন

সারা বাংলা মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের নারায়ণগড় ব্লক সম্মেলন হয় ২২ জুলাই। শুরুতে এক মিছিল বেলদা শহর পরিক্রমা করে এবং ট্রাফিক স্ট্যান্ডে পথসভা হয়। সংগঠনের দাবি, মিড-ডে মিল প্রকল্পের দায়িত্ব এনজিও-র হাতে তুলে দেওয়া চলবে না, কর্মীদের স্থায়ী সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি এবং মাসিক ১৮ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। ১২ দফা দাবিতে বিডিও-র কাছে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। তারপর দেউলী নজরুল ভবনে সম্মেলন সংগঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন দুই শতাধিক কর্মী। বক্তব্য রাখেন এ আই ইউ টি ইউ সি-র রাজ্য নেতা কমরেডস সনাতন দাস ও পূর্ণ চন্দ্র বেরা। গীতা পণ্ডিতকে সভানেত্রী, কবিতা জানাকে সম্পাদিকা ও প্রীতিলতা মাইতিকে কোষাধ্যক্ষ করে ২৫ জনের ব্লক কমিটি গঠন করা হয়।

এআইডিএসও-র সদস্য সংগ্রহে বিপুল সাড়া

'তোমাদের কাজ তোমরা করে যাও'

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার একটি স্কুল। ১৩ জুলাই জেলার এক ডিএসও কর্মী শুরুর সময়ে ওই স্কুলের গেটে দাঁড়ালেন সদস্য ফর্ম, বিদ্যাসাগরের ছবি ও বই হাতে। স্কুলটি মেদিনীপুর শহর ছাড়িয়ে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে। সিপিএমের সময় তাদের সন্ত্রাস, পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের সন্ত্রাস ও বর্তমানে বিজেপি ও তৃণমূলের দ্বন্দ্বে দম বন্ধ করা আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে আছে সেখানে।

বিদ্যাসাগরের দ্বি-শত জন্মবর্ষে ছাত্র আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে ৩১ আগস্ট থেকে সংগঠনের একাদশতম রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার আহ্বান সংবলিত একটি ব্যানার স্কুলের গেটে বেঁধে দিয়ে সন্তর্পণে শুরু হল সদস্য সংগ্রহের কাজ। কথা বলতে বলতে ওই স্কুলেরই একজন ছাত্র রাজি হয়ে গেল কর্মীটির সাথে দাঁড়িয়ে সদস্য সংগ্রহ করতে। হঠাৎ একজন অভিভাবক এসে জানালেন তিনি পরিচালন কমিটির সদস্য। বললেন, স্কুল গেটে দাঁড়িয়ে এসব করা যাবে না। বচসা শুরু হল। তিনি অভিযোগ জানাতে গেলেন প্রধান শিক্ষকের কাছে। এদিকে প্রার্থনার সময় হয়ে যাওয়াতে ছাত্ররা চলে গেল স্কুলের মধ্যে।

কর্মীটি পরিস্থিতি বোঝার জন্য হাতে ছাত্র সংহতি প্রকাশনার বিদ্যাসাগরের বই ও ছবি নিয়ে ঢুকলেন প্রধান শিক্ষকের ঘরে। পৌঁছতেই প্রধান শিক্ষক বললেন, তোমাদের বিরুদ্ধে তো অভিযোগ দায়ের হয়েছে! এরপর একটু হেসে বললেন, এসব তোমাদের ভাবার দরকার নেই, তোমরা তোমাদের কাজ করে যাও। বিদ্যাসাগরের বইটা নিয়ে বললেন, স্টাফ রুমে দেখ কোনও স্যার নেন কি না। তার পরে বললেন, তোমাদের আন্দোলন ফান্ডে টাকা নেবে না? সম্মতি জানালে বললেন, এখন নিলে একটু কম নিতে হবে, বাড়িতে এসো একটু বেশি করে দেব।

স্কুল থেকে বেরিয়ে এসে দেখা গেল বিদ্যাসাগরের বই শিক্ষকরা নিয়েছেন ১০ কপি, ছাত্ররা সদস্য হয়েছে ৪৫ জন। গেটে বেঁধে রাখা ফ্লেক্সটা খুলতে যেতে বয়স্ক গেটকিপার বাধা দিয়ে বললেন, এমন সুন্দর একটা বিষয় আছে তুমি খুলে নিয়ে যাবে! তুমি যখন ছাত্রদের বলছিলে আমি সব শুনেছি। তুমি আমাকে ফ্লেক্সটা দিয়ে যাও আমি প্রতিদিন স্কুলের শুরুতে বাঁধবো আর ছুটির সময় খুলে নিয়ে যাব। অগত্যা রাখতেই হল।

১৫ জুলাই। স্কুলের গেটে ওই কর্মীর সাথে আরও এক কর্মী গিয়েছিলেন প্রচারে। বাস থেকে নেমে দেখলেন সেই বয়স্ক গেটকিপার যত্ন করে বাঁধছেন সংগঠনের ফ্লেক্সটি। স্কুলে ছাত্র আসা শুরু হতেই সেই গেটকিপার ছাত্রদের ডেকে এনে তাদের দেখিয়ে বললেন, দাদারা কী বলছে শোনো।

সেদিন এই স্কুল গেটে সদস্য হয় ৪৮ জন। ফেরার সময় গেটকিপার বললেন, আমি এই ফ্লেক্সটা সম্মেলনের পরেও বাঁধলে হবে? আমাদের কমরেডরা সম্মতি জানিয়ে বললেন, তখন আমরা অন্য আরেকটি ফ্লেক্স দিয়ে যাব।

'ওনারা যা করছেন ভালো করছেন'

ঝাড়গ্রামের একটি হাই স্কুল গেটে ডিএসও-র পক্ষ থেকে সদস্য সংগ্রহ এবং বিদ্যাসাগরের ছবি নিয়ে প্রচার হচ্ছিল। এমন সময় প্রাক্তন এবিটিএ নেতা এক শিক্ষক স্কুলে ঢোকেন। ছাত্রকর্মীদের দেখেই বুঝতে পারেন ডিএসও কিছু একটা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ওনার মোটর সাইকেল ভিতরে রেখে এসে গেটকিপারকে বলেন, গেটে এত ভিড় কিসের? আপনি কী করছেন? ভিড় কমান, কাউকে দাঁড়াতে দেবেন না। বয়স্ক গেটকিপার বলেন, গেটের দায়িত্ব আমার, আমি দেখছি। আপনি ভিতরে যান। ওনারা যা করছেন ভালো করছেন। স্কুলের ভিতরে যে ছাত্ররা গণ্ডগোল করে, যা আপনারা সামলাতে পারেন না, ওদের কথাগুলো শুনলে তারা আর মারামারি করবে না।

উনি চলে যাওয়ার পর আমাদের বলেন, তোমরা যা করছ করো, গেট দেখার দায়িত্ব আমার, তোমাদের কোনও ভয় নেই।

'আমাকে আজ ৩ টাকা দিলেই হবে'

২৭ জুলাই। দু'জন ডিএসও কর্মী পুরুলিয়ার একটি স্কুলে সদস্য সংগ্রহ করছিল। স্কুল গেটে কুলফি বিক্রি করেন যিনি তিনি অনেকক্ষণ থেকে ডিএসও কর্মীদের লক্ষ করছিলেন, কথা শুনছিলেন। সেই সময় ১৩ জন ছাত্র কুলফি কিনতে এল। কুলফির দাম ৫ টাকা।

কুলফি বিক্রেতা সমবেত ছাত্রদের বলেন, তোমরা ২ টাকা করে দিয়ে ওদের সদস্য হও। আমাকে আজ ৩ টাকা দিলেই হবে। উপস্থিত সকল ছাত্র সদস্য হয়। তারপর উনি সংগঠক দু'জনকেও কুলফি খাওয়ান। এই ঘটনা বলতে গিয়ে ওই কর্মীদের একজন কেঁদে ফেলেন।

শিশু নিগ্রহ ঃ নরেন্দ্রপুর থানায় বিক্ষোভ

২১ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার নরেন্দ্রপুর থানার উত্তর খেয়াদাতে পাঁচ বছরের শিশুকন্যাকে যৌন নির্যাতন করে নৃশংস হত্যার প্রতিবাদে নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির পক্ষ থেকে সম্পাদক কল্পনা দত্তের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল নরেন্দ্রপুর থানায় স্মারকলিপি দেয়। দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়। মদের প্রভাবে নারী নির্যাতনের ঘটনা দ্রুত বাড়ছে, তাই মদের প্রসার বন্ধে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

পাঠকের মতামত

কৃত্তিকারা কি এভাবেই হারিয়ে যাবে!

জি ডি বিড়লা স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কৃত্তিকা পালের মৃত্যু আরেকবার গোটা সমাজকে নাড়িয়ে দিল। যেভাবে হাতের ব্লেড কেটে অস্বাভাবিক যন্ত্রণা ভোগ করে সে মৃত্যুবরণ করল তা ভাবলে শিউরে উঠতে হয়। প্রশ্ন হচ্ছে, এই ঘটনার পর কি অভিভাবকরা শিক্ষা নেবেন, স্কুল কর্তৃপক্ষ কি অনেক বেশি দায়িত্ববান হবেন, নাকি এই ধরনের ঘটনা আর কখনও ঘটবে না? ব্যাপারটা সেরকম নয়। মনোবিজ্ঞানীদের যতই সতর্কতামূলক বিশ্লেষণ থাকুক না কেন বা প্রশাসনিক তৎপরতা বৃদ্ধি পাক না কেন এ ঘটনা আবার ঘটার প্রবণতা রোধ করা যাবে না, যেমন করে সিগারেট প্যাকেটের উপরে স্বাস্থ্য সতর্কীকরণ বার্তা দেওয়া থাকলেও ধূমপান বন্ধহয় না।

কী করব, কেমন করে চলব তার নির্দেশনা আজকের এই অসুস্থ সমাজ থেকেই আমাদের চিন্তাজগতে স্থান পায়। অভিভাবকরা চান তাঁদের সন্তান যেন ভবিষ্যতে প্রতিষ্ঠিত হয় অর্থাৎ টাকা উপার্জন করতে শেখে। তাই চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় সাফল্য পেতে আগে থেকেই অনেকটা এগিয়ে রাখতে গিয়ে তাকে অসুস্থ প্রতিযোগিতার মধ্যে নিজেদের অজান্তেই ঠেলে দেন। তার মধ্যে নীতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ গঠনের চেষ্টাও করা হয় না। সমাজবিমুখ ভাবেই সে বড় হতে থাকে একাকী। তারই সঙ্গে বেড়ে ওঠা তার আবেগ, অনুভূতির প্রতি কোনও মর্যাদাই দেওয়া হয় না। তার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে তাকে বোঝার চেষ্টা করা হয় না। তাকে দেওয়া হয় শুধু কর্মচারী হওয়ার শিক্ষাটুকু। প্রকৃত মানুষ হতে তাকে শেখানো হয় না। ঘর, স্কুল, পাড়া সমস্ত জায়গা থেকেই প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণে সে ব্যর্থ হয়। আর বাবা-মায়ের ব্যস্ত জীবনের কারণে তাঁদের যথার্থ সঙ্গ না পেয়ে তারা শিখে উঠতে পারে না বেঁচে থাকার প্রকৃত মানে। বাবা মায়েরা মনে করেন সাফল্যের জন্য প্রয়োজন সকলের থেকে এগিয়ে থাকার মানসিকতা। যে মানসিকতা সন্তানের মধ্যে সৃষ্টি করে জেদ, অন্যের প্রতি বিদ্বেষমূলক আচরণ। আর সবশেষে অসফলতাকে ঘিরে তৈরি হয় এক মানসিক অস্থিরতা। এসবই কৃত্তিকাদের মতো কিশোর-কিশোরীদের ঠেলে দেয় আত্মহননের দিকে।

মূল কথা হল, বাবা-মায়েরা চান সন্তানের জন্য একটি সম্মানজনক কাজ আর তার নিশ্চিত জীবন। এই চাওয়া কোনও অপরাধ নয়। কিন্তু ভাবতে হবে, তিনি কোন ব্যবস্থায় এই স্বপ্ন সফল হওয়ার আশা করছেন। যেখানে বাজার চাহিদার অভাবে একটার পর একটা কারখানা বন্ধ হচ্ছে, যেখানে অনিয়ম, দুর্নীতিকে ভিত্তি করে তীব্র বেকার সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে চাকরির বাজার সংকুচিত, একটা পোস্টের জন্য হাজার হাজার ছেলেমেয়ে আবেদন করছে, কাজ পেলেও তা হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক, যে কোনও সময় কাজ হারানোর আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে, সেখানে নিশ্চিত জীবনের গ্যারান্টি কোথায়? এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করে সুস্থ সামাজিক পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব নয় ঠিকই, তবুও যদি আমরা মনীষীদের জীবনাদর্শ থেকে শিক্ষা নিয়ে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তুলতে পারি, একটি সুস্থ সুন্দর সমাজের ছবি তাদের সামনে তুলে ধরতে পারি, তাহলেও যে কিছু শিশু-কিশোরদের রক্ষা করা যাবে তা নিশ্চিত করে বলা যায়। তাই আজকের দিনে এই আন্দোলন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

গৌতম দাস, মালদা

ভাল লাগল

গণদাবীর ১২ জুলাই ২০১৯ সংখ্যায় 'নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর' প্রবন্ধটি পড়ে খুব ভাল লাগল।

আমি আমার এই অশীতিপর বয়সেও একজন নাট্য সংস্কৃতি কর্মী। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও ফ্রি ল্যান্সার হিসাবে কাজ করে চলেছি কোনও প্রাপ্তি আশা না করেই।

আপনাদের কাগজ সাম্প্রতিক ঘটনাবলির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ও বলিষ্ঠভাবে আমাদের বিস্মৃতপ্রায় মনীষীদের জীবনী প্রকাশেরও উদ্যোগ নিচ্ছে। এই ব্যস্তসমস্ত মোবাইল-ল্যাপটপের যুগেও আমাদের উত্তরসূরীরা এই জীবনীগুলি পড়ে নিশ্চয় উপকৃত হবে বলে মনে করি।

দেবাশীষ চক্রবর্তী
কলকাতা-৩৫

তুফানগঞ্জে ত্রাণের দাবিতে অবরোধ বন্যার্তদের

অতিবর্ষণের কারণে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ বন্যাকবলিত। বহু মানুষ ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। জল নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার ফলে বৃষ্টি একটু বেশি হলেই বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়। মানুষের দুর্গতির শেষ থাকে না। গৃহপালিত গরু, ছাগল, মুরগি, হাঁস নিয়ে মানুষ জেরবার। তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা ২নং অঞ্চলের জলবন্দি মানুষদের নিয়ে এ আই কে কে এম এস-এর মহকুমা সম্পাদক কমরেড অশ্বিনী বর্মন এবং সভাপতি কমরেড কিশোরী মোহন মোদক ২৩ জুলাই গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে যান ত্রিপলের দাবিতে। কর্তৃপক্ষ ত্রিপল দিতে অস্বীকার করলে জলবন্দি মানুষেরা ৩১নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। কিছুক্ষণ অবরোধ চলার পর বি ডি ও-র প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ ওঠে। ত্রিপলের দাবি আদায় হয়।

বিজেপির হামলা ঃ তুফানগঞ্জের বারকোদালী ২নং অঞ্চলে বন্যাকবলিত মানুষদের সংগঠিত করে অঞ্চল অফিসে ডেপুটেশনের জন্য প্রচার চলাকালীন এস ইউ সি আই (সি) কর্মীদের উপর বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি কিল চড় লাথি ঘুসি মারে। আহত হন কমরেড কমল বর্মন। পরে যখন কমরেড বর্মন শহরের দিকে ফিরে আসছিলেন তখন জোড়া পুকুর এলাকায় আবার তাঁর উপর আক্রমণের চেষ্টা হয়। স্থানীয় মানুষ রুখে দাঁড়ালে দুষ্কৃতীরা পালায়। এস ইউ সি আই (সি) তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষ থেকে বিজেপির এই ঘৃণ্য আক্রমণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে।

সংবাদ পরিক্রমা

বেকারত্বের রিপোর্ট ফাঁস হয়েছিল, মানল কেন্দ্র

রাজ্যসভায় কেন্দ্র মেনে নিল, বেকারত্বের হার ৪৫ বছরের মধ্যে সব থেকে বেশি দেখিয়েছিল যে সরকারি (এন এস এস ও-র) রিপোর্ট, তা আসলে ফাঁসই হয়েছিল। পরিকল্পনা ও পরিসংখ্যান প্রতিমন্ত্রী ইন্দ্রজিৎ সিংহের দাবি, এর পেছনে কার হাত আছে, এখন সেটাই খোঁজা চলছে।

...যা শুনে বিরোধীদের তোপ, সরকার নিজেই রিপোর্টটি ধামাচাপা দিয়ে রেখেছিল, যাতে লোকসভা ভোটের আগে বেকারত্বের প্রশ্নে মুখ না পোড়ে। এ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সে সময় স্ট্যাটিসটিক্যাল কমিশনের অনেক সদস্য ইস্তফাও দেন। পরে অবশ্য ভোট মিটতেই প্রকাশ করা হয় ওই রিপোর্ট। সংশ্লিষ্ট মহলের কটাক্ষ, বেকারত্ব দূর করা নিয়ে এই সরকারের মাথাব্যথা নেই। রিপোর্ট ফাঁস করে কে তাদের অস্বস্তির কারণ হয়েছিল, সেটা খুঁজতেই ব্যস্ত তারা।

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯।৭।২০১৯

শিশুধর্ষণে রেকর্ড

সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা শিশুধর্ষণের বিচারে বিলম্ব লইয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন। চলতি বৎসরের প্রথম ছয় মাসে চব্বিশ হাজারেরও অধিক শিশুধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হইয়াছে, কিন্তু কেবল সাড়ে ছয় হাজার মামলার বিচার শুরু হইয়াছে। অধিকাংশ মামলাই তদন্তাধীন, মাত্র চার শতাংশ মামলার রায় বাহির হইয়াছে। স্পষ্টতই শিশুধর্ষণ এবং শিশুদের উপর যৌননিগ্রহের প্রতি 'শূন্য সহনশীলতা' নীতির রূপায়ণ সহজ হইবে না। শিশুধর্ষণের সংখ্যা হ্রাস পাইবার ইঙ্গিত মিলে নাই, তাহার দ্রুত বিচারও এখন অধরা রহিয়া গিয়াছে। প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ এবং বিচারপতি দীপক গুপ্ত এ বিষয়ে দেশের রাজধানীর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। এ বৎসর জুন মাস অবধি নয়াদিল্লিতে ৭২৯টি শিশুধর্ষণের ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহার মাত্র ১৭০টি মামলার বিচার শুরু হইয়াছে এবং কেবল দুইটির রায় বাহির হইয়াছে। রাজধানীতেই এই পরিস্থিতি হইলে বাকি দেশে কী অবস্থা হইতে পারে, সে বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন বিচারপতিরা। ...

..শিশুধর্ষণের ক্ষেত্রে বিচারের সময়সীমা নির্দিষ্ট হইয়াছে যৌননিগ্রহ হইতে শিশুসুরক্ষা (পকসো) আইনেই। ওই আইনের নির্দেশ, মামলার রায় বাহির করিতে হইবে দুই মাসের মধ্যে। কিন্তু কোনও রাজ্য সেই লক্ষ্য পূরণ করিতে পারে নাই। অথচ সরকারের প্রবণতা আইনকে আরও কঠোর, শাস্তিকে আরও তীব্র করিয়া তুলিবার। এখন ফৌজদারি আইনে পরিবর্তন করিয়া শিশুকন্যা নিগ্রহের শাস্তি দশ বৎসরের কারাদণ্ড হইতে বিশ বৎসরের করিবার চেষ্টা চলিতেছে। অথচ অপরাধবিজ্ঞানীদের মতে, শাস্তির তীব্রতার চাইতেও শাস্তি পাইবার নিশ্চয়তা অপরাধীকে নিরস্ত করিতে অধিক কার্যকর হয়। ভারতের বিবিধ আদালতে জমিয়া আছে সাড়ে তিন কোটি মামলা। পুলিশের তদন্ত এতই ছিদ্রবহুল, বিচার এমনই বিলম্বিত যে অপরাধী ফাঁকতালে ছাড়া পাইবার আশা করিতে সাহস পায়। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের হিসাব, ২০১৬ সাল অবধি শিশুনিগ্রহের যত মামলা হইয়াছে, তাহার নিষ্পত্তি কেরলে হইবে ২০৩৯, গুজরাতে ২০৭১ সালে। এত দিন ধরিয়া আদালতে সাক্ষ্য দিবে নির্যাতিত, এই প্রত্যাশাই তো অন্যায়!

আনন্দবাজার পত্রিকা ১৯।৭।২০১৯

মেট্রো রেল আজ পাতাল আতঙ্ক

তিনের পাতার পর

শূন্য পদে স্থায়ী নিয়োগ হবে না? এতে যেমন বেকার যুবকরা কাজ পাবে তেমনি পরিষেবার মান বাড়বে, কমবে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

বিপর্যস্ত বিপর্যয় মোকাবিলার ব্যবস্থা

বিপর্যয় মোকাবিলায় দলের সদস্যসংখ্যা কত জানেন? মাত্র ৫। এতে ট্রাফিক, সিকিউরিটি, ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ও মেডিকেল বিভাগের নিচুতলার অফিসাররা আছেন। প্রায় ২৮ কিমি যাত্রাপথের কোথাও বিপদ ঘটলে এই মাত্র পাঁচজন কী করবেন? এই ৫ জনের তত্ত্বাবধানে যে সমস্ত বিপর্যয় মোকাবিলার কর্মীরা আছেন, তাঁরাও অপ্রশিক্ষিত ও অদক্ষ। বিপর্যয় মোকাবিলায় অগ্নি নিরোধক জ্যাকেট, গ্যাস মুখোশ, অক্সিজেন সিলিন্ডার, আগুন নেভানোর যন্ত্র বেশিরভাগ স্টেশনেই নেই। এমনকি বেশিরভাগ ট্রেনের কামরার ভেতরেও আপৎকালীন বোতাম বা অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র চোখে পড়ে না বলে অভিযোগ। বিপর্যয় যতবার ঘটেছে, হেল্পলাইন নাম্বার কাজ করেনি। যে কোনও ধরনের নাশকতা মোকাবিলায় স্টেশনে স্টেশনে পুলিশ ও সুরক্ষা কর্মীরা যেভাবে থাকেন তাতে আর যাই হোক বিপদ এলে তারা যে তার মোকাবিলা করতে পারবেন, এমন ভরসা রাখা যাত্রীদের পক্ষে মুশকিল।

একদা কলকাতার গর্ব পাতাল রেল আজ পাতাল আতঙ্ক। এর জন্য দায়ী কে? একটার পর একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে আর তদন্তের নাম করে কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র কর্মচারীদের দোষী সাব্যস্ত করে দায় সেরেছে। কিন্তু মেট্রো রেলের বর্তমান অবস্থার জন্য দায়ী তো সরকারি নীতি আর জনগণের প্রতি তার দায়বদ্ধতার অভাব। কর্মচারীদের ত্রুটি বা খামতি হয়তো কিছু আছে কিন্তু তা নগণ্য বরং মাথাভারি প্রশাসন সর্বস্তরের কর্মচারীদের ওপর প্রবল কাজের বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে আর সেই কাজ সঠিকভাবে করতে না পারলে 'ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারির' নামে শাস্তির খাঁড়া কর্মচারীদের ওপর নামিয়ে আনছে। সর্বস্তরে ব্যাপক সংখ্যক কর্মীর ঘাটতি থাকা সত্ত্বেও যতটুকু পরিষেবা সাধারণ মানুষ পান মেট্রো রেলে, তা কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই।

জনসাধারণকে বুঝতে হবে মেট্রো রেলও মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই চালানো হয়। ফলে এখানে যাত্রী পরিষেবা অবহেলিত হয়। পাশাপাশি সরকার মেট্রো পরিষেবাকে ধাপে ধাপে বেসরকারিকরণ করতে চলেছে। যা ইতিমধ্যে রেলের অন্যত্র শুরু হয়েছে। মেট্রো রেলে আরপিএফ বেসরকারিকরণের কথা ভাবা হচ্ছে। এই পরিকল্পনাকে ব্যর্থ করে সুষ্ঠু নিরাপদ নিশ্চিত মেট্রো পরিষেবা পেতে গেলে প্রয়োজন যাত্রী কমিটির পক্ষ থেকে পরিষেবা উন্নয়নের দাবিতে জোরদার আন্দোলন।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

ভারতীয় নবজাগরণের পথিকৃৎ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী আগতপ্রায়। সেই উপলক্ষে এই মহান মানবতাবাদীর জীবন ও সংগ্রাম পাঠকদের কাছে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হচ্ছে শিক্ষাগ্রহণের জন্য।

(৪)

বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাধ্যমে এ দেশে যুক্তিবাদী মন গড়ে তুলতে। কিন্তু সে যুগে নানা কুসংস্কার, যুক্তিহীন বাছবিচার, জাত-পাতের ভেদাভেদ এগুলো সমাজের মধ্যে প্রবলভাবে ছিল। 'ছোটজাত' বলে মানুষকে ঘৃণা করা হত, ছুঁয়ে দিলে অপবিত্র মনে করা হত, মেয়েদের উপর ছিল হাজার বিধিনিষেধ। ঘরের বাইরে বেরোনোর উপায় ছিল না, লেখাপড়া করার অধিকার তো ছিলই না। সমাজের চাপে চোখের জলই ছিল মেয়েদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। এসব মনগড়া বাছবিচার নিয়েই সে যুগের সমাজে মানুষের জীবন কাটত। জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও শাস্ত্রের নামে এসব কুবিচার, বিধিনিষেধ ও কুপ্রথা চলত বলে এ সবের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর সাহস কেউ দেখাত না। বহুযুগ ধরে নীরবে সবাই এগুলো মেনে আসছিল। কিন্তু শিশুবয়স থেকেই বিদ্যাসাগরের মন ছিল যুক্তিবাদী। কলকাতায় এসে ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ইউরোপের সাহিত্য ও ইতিহাস অধ্যয়ন করে নবজাগরণের মানবতাবাদী চিন্তার নতুন ভাবধারায় তিনি আকৃষ্ট হন। মানবতাবাদী চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান ও যুক্তির ভিত্তিতে মানুষকে সমস্ত পুরনো বিধি-বিধানের ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। তাই নারীকে মানুষের মর্যাদা দান করার এবং সমাজ থেকে ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করার চেষ্টায় সর্বশক্তিতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন।

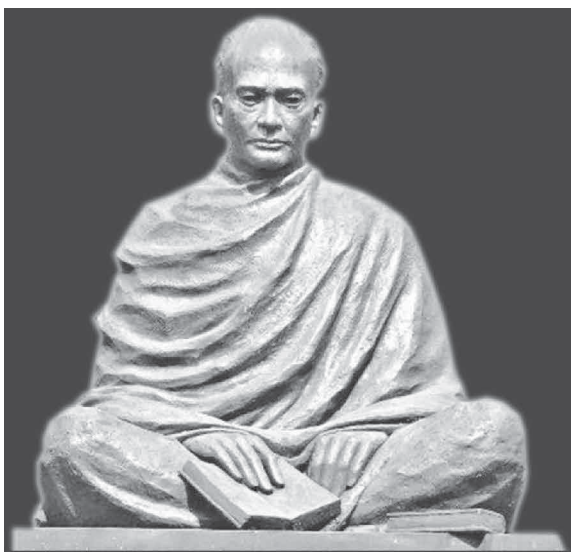

যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, সমাজ থেকে এসব কুপ্রথা দূর করতে গেলে এ দেশের মানুষকে যুক্তিবাদী করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার বিস্তার ঘটলে মানুষ যুক্তিবিচার করতে শিখবে, সমাজের কুপ্রথাগুলির ক্ষতিকর দিক ধরতে পারবে এবং তা থেকে মুক্ত হবে—এই আশা নিয়েই নতুন ভাবধারায় তিনি এ দেশে শিক্ষাবিস্তার করতে চেয়েছিলেন।

১৮৫৩ সালে সরকারি শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিরোধের একটি পরিবেশ তৈরি হয়। বেনারস সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে আর ব্যালেন্টাইনকে শিক্ষা পরিষদ কলকাতা সংস্কৃত কলেজের কাজকর্ম পরিদর্শন করে একটি রিপোর্ট দেওয়ার জন্য আহ্বান করেন। পরিদর্শনের পর ব্যালেন্টাইন কিছু সুপারিশ করেন। তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের 'লজিক' তথা তর্কশাস্ত্রের একট সরল সারাংশ নিজে লিখেছিলেন। তিনি সেই পুস্তিকাটি এবং বিশপ বার্কলের রচিত দর্শনের বই 'এনকোয়ারি' সংস্কৃত কলেজে পাঠ্য করার সুপারিশ করেন। বিদ্যাসাগর এর বিরোধিতা করলেন।

তিনি দেখালেন ব্যালেন্টাইনের লেখার সারাংশ পড়ার চাইতে মিলের মূল পুস্তক পড়লে ছাত্রদের উপকার বেশি হবে। আর বার্কলে ভাববাদী দার্শনিক, তাঁর বইও ছাত্রদের তেমন কাজে লাগবে না। তাঁর লেখা পুস্তক সম্পর্কে বললেন—'কতকগুলি কারণে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য আমাদের পড়াতেই হচ্ছে। ... কিন্তু সাংখ্য ও বেদান্ত যে ভ্রান্ত দর্শন, সে সম্বন্ধে এখন আর বিশেষ মতভেদ নেই। তবে ভ্রান্ত হলেও এই দুই দর্শনের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধা আছে। আমাদের উচিত সংস্কৃত পাঠক্রমে এগুলি পড়ানোর সময়ে, এদের প্রভাব কাটানোর জন্য ইংরেজি পাঠক্রমে খাঁটি দর্শন দিয়ে এগুলির বিরোধিতা করা। বিশপ বার্কলের 'এনকোয়ারি' পড়লে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হবে বলে মনে হয় না, কারণ সাংখ্য ও বেদান্তের মতোই বার্কলেও একই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। ইউরোপেও এখন আর বার্কলের দর্শন খাঁটি দর্শন বলে বিবেচিত হয় না, কাজেই তা পড়িয়ে উদ্দেশ্য সাধিত হবে না।' তাই নতুন করে এ বই তিনি পাঠ্য করতে চাইলেন না। বিদ্যাসাগরের যুক্তি শিক্ষা পরিষদ মেনে নিল, তাঁর উপর অগাধ আস্থা ছিল বলে এ বিষয়ে কোনও বিরোধ হল না।

ওই সময়ে বাংলার ছোটলাট ছিলেন হ্যালিডে সাহেব। তিনি বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও আদর্শকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন। এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য উৎসাহও তাঁর ছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের মনের ইচ্ছা জানিয়ে বললেন—'সাহেব, আমার ইচ্ছা বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে কিছু বাংলা স্কুল গড়ে তুলব, এ ব্যাপারে আপনার সাহায্য চাই।'

হ্যালিডে উৎসাহিত হয়ে বললেন—'আপনি আপনার পরিকল্পনার কথা লিখে আমাকে জমা দিন। আমি শিক্ষা কাউন্সিলের সাথে আলোচনা করে আপনার ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করব।'

পরিকল্পনা বিদ্যাসাগর আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন। শিক্ষা কাউন্সিলের কাছে তা পেশ করলেন। কাউন্সিল তাঁর পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করলেন। তাঁকেই পরিদর্শক নিযুক্ত করে জেলায় জেলায় স্কুল স্থাপনের দায়িত্ব দিলেন। সেটা ছিল ১৮৫৫ সাল। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৫ বছর। চারটি জেলার গ্রামে গ্রামে ঘুরে প্রতি জেলায় ৫টি করে মোট ২০টি মডেল স্কুল তৈরি করলেন। গৃহ নির্মাণের জন্য গ্রামের মানুষের কাছ থেকে সাহায্য সংগ্রহ করলেন।

স্কুলগুলি পরিচালনা করতে গিয়ে দেখলেন যোগ্য শিক্ষক এবং বাংলা পাঠ্যপুস্তকের খুবই অভাব। গ্রামের পণ্ডিতরা সংস্কৃত জানেন কিন্তু মাতৃভাষা বাংলায় দখল নেই। বর্তমানের উপযোগী অনেক বিষয়ে তাঁদের জ্ঞান নেই, কুসংস্কার তাঁদের মধ্যে প্রবল। যুক্তির চর্চা তাঁরা করেন না।

এজন্য উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব পূরণ করতে কাউন্সিলের অনুমতি নিয়ে তিনি নিজেই সংস্কৃত কলেজে শিক্ষক তৈরির উদ্দেশ্যে একটি 'নর্মাল স্কুল' খুললেন। বাংলা পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূরণের জন্য বাংলা বই লিখতে শুরু করলেন। বাংলা বর্ণমালা ও বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য উন্নত বিজ্ঞানসম্মত প্রথা আবিষ্কার করে লিখলেন 'বর্ণপরিচয়'-এর প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ। এ ছাড়া 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী' ইত্যাদি নীতিশিক্ষামূলক কয়েকটি মূল্যবান বই অনুবাদ করলেন। বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রথম সোপান হিসাবে বর্ণপরিচয়ের মূল্য আজও সকলেই স্বীকার করেন।

১৮৪৯ থেকে ১৮৬৯-এর মধ্যে তিনি অনেকগুলি শিক্ষামূলক গ্রন্থের অনুবাদ করেন, ব্যাকরণ শেখার বই লেখেন। যেমন 'বাংলার ইতিহাস', সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে উপযোগী পুস্তক 'ঋজুপাঠ', 'ব্যাকরণ কৌমুদী-র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ, অনুবাদ গ্রন্থ— 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'সীতার বনবাস' ইত্যাদি।

এ ছাড়াও বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ বিষয়ক যুক্তি তর্ক সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখেন। এই লেখাগুলির মধ্য দিয়ে অনুন্নত বাংলা গদ্যভাষাকে সমৃদ্ধ করে আধুনিক বাংলা গদ্যের জন্ম দেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের আগে বাংলা গদ্যের ভাষা ছিল অত্যন্ত কঠিন ও আড়ষ্ট। শুনতেও মধুর লাগত না। ছেদ, যতি ইত্যাদি বিরামচিহ্নের সুষ্ঠু ও সার্থক ব্যবহার করে বাংলা গদ্যকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে গড়ে তোলেন। এ জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—'বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।'

গ্রামে গ্রামে স্কুল করতে গিয়ে তাঁর মনে হয় গ্রামাঞ্চলে নারীশিক্ষার প্রচলন দরকার। সে সময় নারী শিক্ষার সূচনা হলেও এ দেশের সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ তা মেনে নেয়নি। কলকাতায় বেথুন সাহেবের উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে উঠলেও তা তেমনভাবে চালু হয়নি। তাই বেথুন সাহেব বিদ্যাসাগরের সাহায্য চেয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরও চেয়েছিলেন এ দেশে নারী শিক্ষার প্রচলন হোক। শুধু কলকাতায় নয়, গ্রামে গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু এ কাজটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। এ দেশের গোঁড়া হিন্দু সমাজে মেয়েদের লেখাপড়া ছিল শাস্ত্র ও লোকাচার বিরুদ্ধ। এ দেশের লোক বিশ্বাস করত মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সংসারের অকল্যাণ হয়, মেয়েরা খারাপ হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি স্বামীর মৃত্যু হয়, অর্থাৎ মেয়ে বিধবা হয়। বিদ্যাসাগর বুঝেছিলেন, সমাজ ও সংসারকে সুন্দর করতে গেলে, সমাজ থেকে কুপ্রথা, কুসংস্কার দূর করতে গেলে নারী শিক্ষার প্রসার দরকার। হ্যালিডে সাহেবকে তিনি মনের ইচ্ছা জানালেন।

হ্যালিডে সাহেব বললেন—'বেশ তো পণ্ডিত, আপনি স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিন, বালিকা-বিদ্যালয় গড়ে তুলুন, আমি গর্ভনমেন্টের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলব।'

আশ্বাস পেয়ে বিদ্যাসাগর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বর্ধমানের জৌগ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। সরকারি সাহায্যের সম্ভাবনা উজ্জ্বল দেখে প্রাণান্ত পরিশ্রমে হুগলি, বর্ধমান, নদিয়া, মেদিনীপুর—এই চারটি জেলায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করলেন। গ্রামাঞ্চলে কুসংস্কার ছিল প্রবল। মেয়েদের স্কুলে পাঠালেই সমাজের মাথারা একঘরে করে দিত। অনেকেই মেয়েদের বিয়ে দেওয়া যাবে না এই ভয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠাত না। প্রবল বাধার মধ্যে বিদ্যাসাগর নিজে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বুঝিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করলেন। তাঁর আশা ছিল বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু সরকারি তহবিলে টাকা নেই এই অজুহাত দেখিয়ে বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য সাহায্যের আবেদন ব্রিটিশ সরকার অগ্রাহ্য করল।

ব্রিটিশরা এ দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য আসেনি, এসেছিল বাণিজ্য করতে। নিজেদের শাসন বজায় রাখতে ইংরেজি জানা অল্পসংখ্যক কেরানি তৈরির জন্য তাঁরা এ দেশে কিছুটা শিক্ষার বিস্তার চেয়েছিল, তার বেশি চায়নি। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ' হয়ে গেলে ব্রিটিশরা ভয় পেয়ে গেল। তারা এ দেশে আর শিক্ষা বিস্তার চাইল না। বালিকা বিদ্যালয়গুলির জন্য সাহায্যের আবেদন তারা অগ্রাহ্য করলে খুবই বিপদে পড়লেন বিদ্যাসাগর। তিনি শিক্ষা বিভাগের কাছে লিখলেন—'সরকারি সাহায্যের আশ্বাস পেয়েই আমি এতগুলি বালিকা বিদ্যালয় গড়ে তুলেছি। স্থানীয় লোকেরা স্কুলগৃহ তৈরি করে দিলে সরকার বাকি খরচ চালাবেন এ আশ্বাস আমাকে দিয়েছিলেন। এখন এতগুলি স্কুলের খরচ ও শিক্ষকদের বেতন সরকার না দিলে আমাকেই দিতে হবে, সেটা আমার উপর খুবই অবিচার হবে।' কোনও আবেদনেই সরকারি সাহায্য পাওয়া গেল না। কোনও কাজ শুরু করে সমস্যার সামনে কখনওই পিছিয়ে আসতেন না বিদ্যাসাগর। তিনি তখন স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহী, সম্পন্ন ব্যক্তিদের কাছে গেলেন সাহায্যের আবেদন নিয়ে। নিজেই বেশিরভাগ খরচ বহন করে স্কুলগুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন।

এ সময় শিক্ষাবিভাগের বিশেষ অধিকর্তা গর্ডন ইয়ং সাহেবের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পদে পদে মতবিরোধ দেখা দেয়। ইয়ং সাহেব সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের বেতন বাড়াতে চাইলে বিদ্যাসাগর বাধা দিলেন। তিনি দেখলেন সরকারি পদে থেকে আর শিক্ষাপ্রসারের কাজ করার সম্ভাবনা কম। ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাধ্য হয়ে তিনি সরকারি পদে ইস্তফা দিলেন, তখন তাঁর মোট বেতন ছিল ৫০০ টাকা। তখনকার দিনে ৫০০ টাকার মূল্য আজকের ৫০ হাজারেরও বেশি। হ্যালিডে সাহেব ডেকে পাঠালেন তাঁকে। বললেন— 'পণ্ডিত, আপনি ইস্তফা ফিরিয়ে নিন।'

বিদ্যাসাগর বললেন—'না সাহেব, যে কাজ স্বাধীনভাবে করতে পারব না, নিজের আদর্শ যে কাজে রক্ষা করতে পারব না, শুধু টাকার জন্য সে কাজ করতে আমি রাজি নই।'

হ্যালিডে সাহেব বললেন—'আমি জানি, আপনি সব দানধ্যান করেন, বহ গরিব ছাত্রদের পড়াশোনার খরচ দেন, নিজের জন্য কিছুই রাখেন না। চাকরি ছেড়ে দিলে আপনার চলবে কী করে?'

বিদ্যাসাগর বললেন—'সাহেব, ভাববেন না, এখন দু'বেলা খাই, তখন না হয় একবেলা খাব। তাও না জোটে একদিন অন্তর খাব, কিন্তু যে কাজে সম্ভ্রম নেই, স্বাধীনতা নেই, সে কাজ আমি করতে চাই না'

বন্ধুরা বললেন—'বিদ্যাসাগর তুমি ভাল কাজ করলে না। আজকালকার যুগে ৫০০ টাকার চাকরি পাওয়া সোজা নয়। এখন তোমার চলবে কী করে?'

আটের পাতায় দেখুন

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

খরা প্রতিরোধের দাবিতে বাঁকুড়ায় ব্লকে ব্লকে কৃষক বিক্ষোভ

খরায় জ্বলছে বাঁকুড়া। আমনের ভরা মরশুমেও চাষিরা কাজে নামতে পারছেন না। নেই গ্রামীণ মজুরদের কাজ। এই অবস্থায় অল ইন্ডিয়া কিষাণ-খেতমজদুর সংগঠনের বাঁকুড়া জেলা কমিটির ডাকে ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হলেন কৃষকরা। স্থায়ী সেচ, বকেয়া মজুরি প্রভৃতি দাবিতে ২১ জুলাই রানিবাঁধ বিডিও-তে বিক্ষোভ দেখান চাষিরা। বিডিও চাষিদের সার-কীটনাশক প্রদান ও ১০০ দিনের কাজে বকেয়া মজুরি মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন। বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন কমরেড মানিক মহাপাত্র। উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কমরেড তারাশঙ্কর গোপ।

২৩ জুলাই হীড়বাঁধ, ওন্দা, বাঁকুড়া-২ এবং গঙ্গাজলঘাটি ব্লকের বিডিও দপ্তরগুলিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। হীড়বাঁধের গ্রামগুলি থেকে আসা কৃষকরা মিছিল করে বিডিও দপ্তরে যান। বিডিও বকেয়া মজুরি মেটানো ও কাজ দেওয়ার আশ্বাস দেন। জেলা সম্পাদকের উপস্থিতিতে এখানকার কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন কমরেড গণেশ হাঁসদা ও কমরেড অশোক মণ্ডল। ওন্দায় আন্দোলনের ফলে বিডিও গরিব মানুষের বাড়ি তৈরি ও বার্ধক্য ভাতা প্রদানের আশ্বাস দেন। বাঁকুড়া-২ এবং গঙ্গাজলঘাটিতে বিডিও সেচের সুনির্দিষ্ট স্কিমের প্রস্তাব কার্যকর করার আশ্বাস দেন। এই দুই জায়গায় বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন জেলা সভাপতি কমরেড দিলীপ কুণ্ডু।

বেঙ্গল কেমিক্যালস বন্ধের চক্রান্তের প্রতিবাদে রাজভবনে এ আই ইউ টি ইউ সি-র বিক্ষোভ

ঐতিহ্যবাহী রাষ্ট্রায়ত্ত লাভজনক ওষুধ কারখানা বেঙ্গল কেমিক্যালস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। এই চূড়ান্ত শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী ও জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এ আই ইউ টি ইউ সি-র নেতৃত্বে শ্রমিক-কর্মচারীরা ২৫ জুলাই রাজভবনের নর্থ গেটে বিক্ষোভ দেখান। বেঙ্গল কেমিক্যালস কারখানার গেটেও শ্রমিকদের বিক্ষোভ হয়। প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে রাজ্যপালের মাধ্যমে প্রতিবাদপত্র জমা দেওয়া হয়।

বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত লাভজনক এই সংস্থা বন্ধ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের সাথে সাথে পাবলিক সেক্টর ইউনিটগুলি ও অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি বিলগ্নিকরণের প্রচেষ্টা বন্ধ করার দাবি জানানো হয়েছে। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য আহ্বান জানান, মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেট হাউসের লাভের স্বার্থে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার যেভাবে জনগণের টাকায় গড়ে ওঠা রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাগুলিকে বেচে দিচ্ছে, একমাত্র লাগাতার যুক্ত শ্রমিক আন্দোলনই পারে তাকে প্রতিহত করতে। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে পুলিশ হস্তক্ষেপ করে এবং রাজ্য সম্পাদক কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য সহ ৪০ জন আন্দোলনকারী গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

ইউএপিএ সংশোধনী ফ্যাসিবাদী
দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বিজেপি সরকারের ফ্যাসিবাদী আইনের প্রতিবাদে বাম-গণতান্ত্রিক ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে ২৬ জুলাই নিম্নের প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন ঃ

কেন্দ্রের বিজেপি সরকার লোকসভায় সংখ্যাধিক্যের জোরে গত ২৪ জুলাই 'বেআইনি কার্যকলাপ (নিরোধক) সংশোধনী বিল' (ইউএপিএ) যেভাবে পাশ করিয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা করছি। ১৯৬৭ সালে তদানীন্তন কংগ্রেস সরকার কর্তৃক প্রণীত এই আইনে পরবর্তীকালে আনীত সকল সংশোধনীর উপর বর্তমান সংশোধনীটি যে কোনও ব্যক্তিকে শুধু সন্দেহের বশে সন্ত্রাসবাদী বলে চিহ্নিত করার অধিকার দিল সরকারকে। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) আইনে আর একটি সংশোধনী এনে এই সংস্থার হাতে এখন ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে যার দ্বারা তারা যে কোনও অপরাধকে সন্ত্রাসবাদী তকমা দিয়ে তদন্ত করতে পারবে, কোনও রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে যুক্ত না করেই তারা সরাসরি সে রাজ্যে ঢুকতে পারবে, কোনও ব্যক্তির সম্পত্তিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের দ্বারা অর্জিত এই সন্দেহেই বাজেয়াপ্ত করতে পারবে এবং ১৪ দিনের পরিবর্তে ৩০ দিন জেলবন্দি করতে পারবে। দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার অজুহাতে এই সকল সংশোধনী নিঃসন্দেহে সরকারের হাতে এমন স্বৈরাচারী ক্ষমতা তুলে দিল, যার দ্বারা সরকার যে কোনও প্রতিবাদী মানুষের কণ্ঠ রোধ করতে পারবে, সরকার বিরোধী ও শোষণমূলক ব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলনকে দেশ-বিরোধী ও সন্ত্রাসবাদী আখ্যা দিয়ে ক্ষমতার আরও কেন্দ্রীকরণ ও প্রশাসনিক ফ্যাসিবাদকে আরও পাকাপোক্ত করার সুযোগ পাবে।

আমরা দেশের সকল বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও শক্তিগুলিকে এবং শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে এগিয়ে এসে এই দানবীয় আইনগুলির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাচ্ছি।

তথ্যের অধিকার আইনকে প্রহসনে পরিণত করা হল

বলেন,এস ইউ সি আই (সি)-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ জুলাই এক বিবৃতিতে

বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার কতটা নগ্নভাবে এবং স্বৈরাচারী কায়দায় গণতন্ত্রকে হত্যা করে চলেছে, আর টি আই আইনের সংশোধনী তার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। এই সংশোধনীর দ্বারা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য তথ্য কমিশনকে কেন্দ্রীয় সরকারের লেজুড়ে পরিণত করা হল ও তার মধ্য দিয়ে আর টি আই একটি পুতুল সংস্থায় পরিণত হল। কোনওরকম বিরোধী মতের তোয়াক্কা না করে এবং সংসদে কোনওরকম বিতর্কের সুযোগ না দিয়েই ২২ জুলাই অস্বাভাবিক দ্রুততায় এই সংশোধনীটি পাশ করানো হল। কেন্দ্রের ও রাজ্যের তথ্য কমিশনারদের নিয়োগ এমনকি তাদের বেতন, অধিকার এবং চাকরির অন্যান্য শর্তও স্থির করার পূর্ণ অধিকার এই সংশোধনীর দ্বারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হল। 'বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র' বলে কথিত এই দেশ ভারতবর্ষের শাসক দল এইভাবে তথ্য জানার নাগরিক অধিকারকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে দিল, সরকারের নানা অপকর্ম সম্পর্কে এতদিন সাধারণ মানুষ যেটুকু তথ্য ও পরিসংখ্যান জানতে পারত, তার সমাধি রচনা করা হল।

এই স্বৈরাচারী সংশোধনীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করতে এবং অবিলম্বে তা বাতিলের দাবি জানাতে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন সমস্ত চিন্তাশীল মানুষকে আমরা দেশজুড়ে আন্দোলনে এগিয়ে আসার জন্য আবেদন করছি।

নবজাগরণের পথিকৃৎ বিদ্যাসাগর

সাতের পাতার পর

বিদ্যাসাগর একটু হেসে উত্তর দিলেন—'আমার কাছে আত্মসম্মানই বড়, টাকা বড় নয়।' বললেন, তা ছাড়া আমি যখন সংস্কৃত কলেজের সেক্রেটারির পদ পরিত্যাগ করেছিলাম, তখন আমার কী ছিল? এখন তবু তো আমার প্রণীত ও প্রকাশিত পুস্তকের কতক আয় আছে।'

চাকরি ছেড়ে দিয়ে বিদ্যাসাগর স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পেলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে দেশে শিক্ষাপ্রসারের কাজে নিযুক্ত রাখবেন, এই অঙ্গীকার নিয়ে পদত্যাপত্র লিখেছিলেন।

পদত্যাগের পর বালিকা বিদ্যালয়গুলি বাঁচিয়ে রাখার জন্য নিজের চেষ্টায় একটি নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভাণ্ডার খুললেন। তাঁর আহ্বানে বেশ কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিয়মিত চাঁদা দিতে লাগলেন। এ ভাবেই বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করলেন তিনি। নিজেও খরচ বহন করতে লাগলেন।

(চলবে)

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রতিবাদ

২৫ জুলাই অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির উদ্যোগে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। মূল প্রস্তাব পেশ করেন অধ্যাপক যোগরাজন। বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক পি শিব কুমার, অধ্যাপক করুণানন্দন, অধ্যাপক আর মানিবানান, অধ্যাপক আর মুরলী, অধ্যাপক আরুল আরম এবং এআইডিএসও-র রাজ্য সম্পাদক এম জে ভলতেয়ার। কনভেনশন সঞ্চালনা করেন অধ্যাপক এস এইচ থিলাগর। বক্তারা কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ বিশ্লেষণ করে এর জনবিরোধী দিকগুলি চিহ্নিত করেন এবং তার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলনের আহ্বান জানান। তাঁদের দাবি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক বৈজ্ঞানিক শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com